দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে বিজেপিকে
পৃঃ ২৩

মমতা-রাহুলের সর্বভূতে সঙ্ঘদর্শন
—পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১৯ নভেম্বর ২০১৮।। ২ অগ্রহায়ণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

আর কতদিন উপেক্ষিত থাকবে শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির

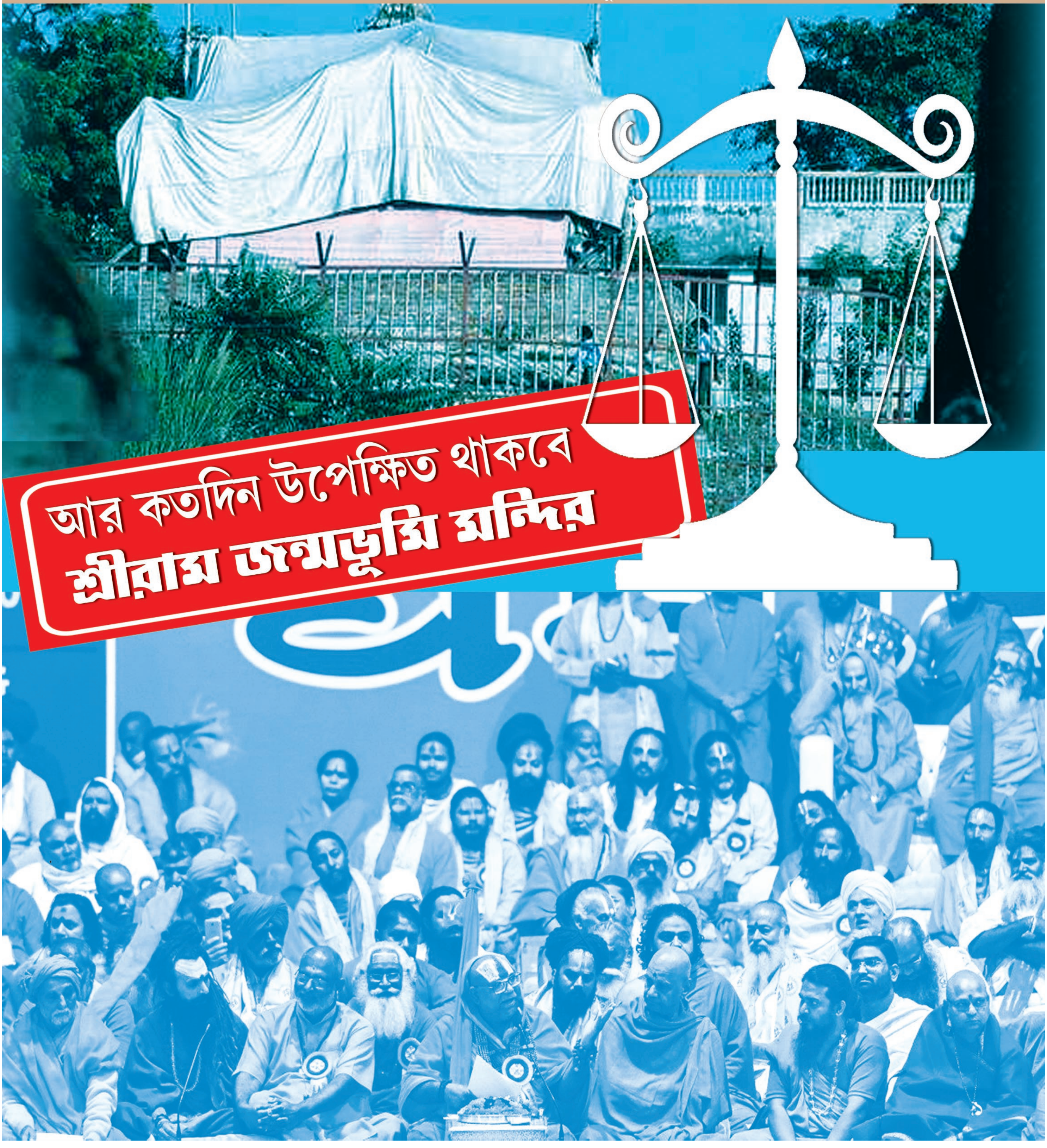

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৯ নভেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-কংগ্রেস গোপন জোট হয়েছে
□ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলাচিঠি : দিদিই চেনেন বাঙ্গালিকে □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ব্যভিচারের আইনগ্রাহ্যতা ও নৈতিকতা □ শারধী রাজ □ ৮

মমতা-রাহুলের সর্বভূতে সঙ্ঘদর্শন
□ সাধন কুমার পাল □ ১১

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্লোগান ছাড়া কিছু নয়
□ সনাতন রায় □ ১৩

গণতান্ত্রিক অধিকারের আত্মঘাতী সুপ্রিম কোর্ট
□ অষ্টম কুমার মাঝি □ ১৫

সর্দার প্যাটেল আধুনিক ভারতের সংহতি-পুরুষ
□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৯

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি-সংঘর্ষ ইতিহাস
□ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ □ ২১

রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে বিজেপিকে
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৩

আদালত এবিসিডি খেলছে, হিন্দুরা রামমন্দিরের জন্য আর অপেক্ষায় রাজি নয় □ প্রীতীশ তালুকদার □ ২৫

রামমন্দির মামলার শুনানির জন্য সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে
□ অমৃতলাল ধর □ ২৭

বিশ্বমাতা দেবী জগদ্ধাত্রী □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বঙ্গপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব নবান্ন
□ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৩৩

গল্প : সমাপন □ মালিনী চট্টোপাধ্যায় □ ৩৫

যুগস্রষ্টা শিশির কুমার □ কণিকা দত্ত □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৭-১৮** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □ **অঙ্গনা : ৪১** □ **অন্যরকম : ৪২** □ **স্মরণে : ৪৫** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ নভেম্বর, ২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন

প্রকাশিত হবে ২৬ নভেম্বর, ২০১৮

উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই এসে পড়েছে ভোটের মরশুম। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও মিজোরাম— এই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ছত্তিশগড়ে ইতিমধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। মাওবাদী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভোট দিয়েছেন প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ। এখন সকলের চোখ অবশিষ্ট রাজ্যগুলিতে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে তিনটি বিশ্লেষণাত্মক রচনা। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অবিলম্বে মন্দির হউক

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরিয়া ঝুলিয়া থাকা রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটি আবার বিশ বাঁও জলে নিক্ষেপ করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাহার যে সিদ্ধান্তটি জানাইয়াছে তাহা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে একপ্রকার হতভম্বই করিয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট জানাইয়াছে, রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটি তাহাদের অগ্রাধিকারের তালিকাতেই পড়ে না। বুঝাই যাইতেছে, বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন যে বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তটি লইয়াছেন, তাঁহারা কখনই চান না যত শীঘ্র সম্ভব রামমন্দির মামলার একটি সুষ্ঠু মীমাংসা হউক। এই বেঞ্চ বলিয়াছে, জানুয়ারি মাসে স্থির হইবে কবে এই মামলার শুনানি শুরু হইবে। অথচ ইতিপূর্বে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করিবার পক্ষেই মত দিয়াছিলেন। সেইদিক দিয়া বিচার করিলে সুপ্রিম কোর্টের এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির মতকে অশ্রদ্ধা করিবারই নামান্তর। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হতবাক হইলেও খুশি হইয়াছে কংগ্রেস। কংগ্রেস প্রথমাবধি পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা বিদেশি মুসলমান আগ্রাসনকারী বাবরের প্রতিই তাহাদের যাবতীয় প্রেম-প্রীতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে।

শুনানি শুরু হইলে এই মামলার রায় যে রামমন্দিরের পক্ষেই যাইবে—তাহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়াই বাবরের সেনাপতি মির বাকি ওই স্থানে বাবরি মসজিদের ধাচা নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে, প্রশ্নটা এখন রামজন্মভূমির অস্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া নহে। এখন প্রশ্নটি ওই রামজন্মভূমিতে কত শীঘ্র সম্ভব শ্রীরামচন্দ্রের একটি ভব্য মন্দির নির্মাণ করা যায়—তাহাই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ এই মন্দির নির্মাণের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—'মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত / সম্পদে কে আছে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক...' যুগ যুগ ধরিয়া এই রামচন্দ্রকে ভারতবাসী তাঁহার জাতীয় জীবনের নায়ক মানিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আবেগ আবর্তিত হইয়াছে। সেই আবেগ লইয়া ছেলেখেলা করা কখনই কাম্য নয়। শবরীমালা বা সমকামিতা বিষয়ক মামলার যদি দ্রুত নিষ্পত্তি করিতে অসুবিধা না হয়, রাত-বিরাতে আদালত বসাইয়া যদি শহুরে নকশালদের আবেদনের শুনানি করা যায়— তাহা হইলে অগ্রাধিকারের তালিকায় না রাখিয়া রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটিকে বিশ বাঁও জলে নিক্ষেপ করা যে সমীচীন নয়—তাহা বুঝিতে হইবে সর্বোচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিদের।

ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ দীর্ঘদিন সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। সহিষ্ণুতার অর্থ যে কাপুরুষতা নয়—ইহাও বুঝিতে হইবে সকলকে। দীর্ঘ পাঁচ দশক এই সহিষ্ণুতার পরিচয় হিন্দু সমাজ দিয়াছে। এখন আদালত যদি কোনও নিষ্পত্তি করিতে আগ্রহী না হয়—তাহা হইলে অধ্যাদেশ আনিয়া রামমন্দির নির্মাণের কার্য শুরু হউক—ইহাই সমগ্র হিন্দু সমাজের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার মর্যাদা প্রশাসনকে দিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

পরোপদেশ পাণ্ডিত্যে শিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি বৈ।

বিস্মরন্তি হি শিষ্টত্বং স্বকার্যে সমুপস্থিতে।।

অন্যকে উপদেশ দেবার সময় সবাই জ্ঞানী সাজেন। কিন্তু নিজের বেলায় সেই পাণ্ডিত্য ভুলে যান।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-কংগ্রেস গোপন জোট হয়েছে

উগ্র বামপন্থী মাওবাদীরা কি গরিব মানুষের বন্ধু? মোটেই না। তারা সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক। নৃশংস খুনিও বলা যেতে পারে। এই সত্যিটা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাও আবার বলেছেন ছত্তিশগড়ের মাওবাদীদের গড় বলে পরিচিত জগদলপুরের জনসভায়। দিল্লির নিরাপদ প্রধানমন্ত্রীর আবাস থেকে নয়। নকশালপন্থী নেতারা যে নিষ্ঠুর নরহত্যাকারী গুপ্ত ঘাতক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সার কথাটা ছত্তিশগড়ের নীচুতলার মাওবাদী কর্মীরা ধীরে ধীরে বুঝছেন। সম্প্রতি সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চেয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ছত্তিশগড়ের ৬২ জন মাওবাদী গেরিলা। তাঁরা বলেছেন, 'মাওবাদী ভাবধারা সারবত্তাহীন হিংসায় মদত দেয়। সহজ, সরল আদিবাসী যুবকদের ভুল বুঝিয়ে তাদের গুপ্তঘাতকে পরিণত করছে।'

ছত্তিশগড় বিধানসভার প্রথম দফার নির্বাচন হলো রাজ্যের মাও প্রভাবিত ১৮টি আসনে ১২ নভেম্বর। দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২০ নভেম্বর বাকি ৭২টি বিধানসভা কেন্দ্রে। মাওবাদীরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে। অথচ তলে তলে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য নেতা অজিত যোগীর সঙ্গে মাওবাদী নেতৃত্বের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সেকথা অজানা নেই ছত্তিশগড়ের সাধারণ মানুষের। এই রাজ্যের ২০টি ব্লকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বাঙ্গালি উদ্বাস্তু। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা সশস্ত্র মাওবাদীদের বিরোধী। উন্নয়নের প্রশ্নে বাঙ্গালি ভোটাররা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহের সমর্থক। তাঁরা যে এককাট্টা হয়ে বিজেপিকে ভোট দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। ছত্তিশগড়ের বাঙ্গালি নেতা শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং অসীম দত্ত বলেছেন, 'কংগ্রেস তো বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য কিছুই করেনি। বিজেপি ক্ষমতায় এসে শরণার্থী শিবিরের প্রত্যেককে জমির পাট্টা দিয়েছে। এখন বাঙালি পরিবারের মানুষজন সম্মানের সঙ্গে ছত্তিশগড়ে বাস করছেন।' এবার সেখানে নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবের বাঙ্গালি যুবকরা সাড়ম্বরে দুর্গা ও কালীপুজো করেছেন। কালীপুজোর বাজেটই ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। তিনদিন ধরে উৎসব চলেছিল। একদা যাঁদের পুর্বপুরুষরা এক বস্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভিটেমাটি ছেড়ে এই রাজ্যের শরণার্থী শিবিরে মাথা গুঁজে ছিলেন, সেই বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা, বরং বলা ভালো তাঁদের উত্তরপুরুষেরা আজ ছত্তিশগড়ের রাজনীতিতে নির্ণায়ক শক্তি। বাঙ্গালিরা এখানে একজোট হয়ে তাঁদের পছন্দের প্রার্থী বা দলকে ভোট দেন। এবার বিজেপি তাঁদের প্রথম পছন্দের দল।

গূঢ় পুরুষের কলম

প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন, শহুরে তথাকথিত মাওবাদী বুদ্ধিজীবীরাই গরিব সরল আদিবাসী যুবকদের বিপথগামী করছে। ছত্তিশগড়ে দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীরা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করলে শহরের শিক্ষিত মাওবাদীরা দুঃখ প্রকাশ করে না। মানবাধিকার রক্ষাকারীরা টুঁ শব্দটি করেন না। তাঁদের বিবেক দংশন হয় না। কারণ, শহুরে বুদ্ধিজীবী নকশালরা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের। তাঁরা যথেষ্ট আরামে থাকেন। ছেলেমেয়েরা বড়ো বড়ো স্কুল কলেজে পড়ে। আর গ্রামের মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেন। তাই বলছি, আর নয়, এবার আমাদের একজোট হয়ে শহরের নকশাল লেখক বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে হবে। অনেক আগেই এটা করা উচিত ছিল। আমরা করিনি বলেই শহুরে নকশাল কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধ লেখকরা আজ ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। গাঁয়ের লোকদের দিয়ে দেশে বিপ্লব ঘটানোর খোয়াব দেখাচ্ছেন। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার বিপ্লবী বুলি আওড়াচ্ছেন। ছত্তিশগড়ে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস এবার নির্বাচনী সমঝোতা করেছে। সারা দেশেই বাম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মাওবাদীদের গোপন সম্পর্ক বারেবারেই সামনে এসেছে। গত আগস্ট মাসে পুণে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শহুরে নকশাল নেতা ভারভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, অরুণ ফেরেইরা-সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রধানন্ত্রীকে খুনের যে ছক নকশালরা করেছিল, ধৃতরা সেই চক্রান্তে যুক্ত ছিল। সেই প্রেক্ষিতে নকশাল গড়ে দাঁড়িয়ে মোদীজীর শহুরে নকশালদের কড়া সমালোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসের প্রধান নেতা রাহুল গান্ধী মাওবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নিন্দা করতে একটি বাক্যও খরচ করেননি। বরং এড়িয়ে গিয়েছেন মাওবাদী ইস্যু। হ্যাঁ, দান্তেওয়াড়ায় পাঁচজন নিরস্ত্র মানুষের হত্যার রক্ত তখনও শুকায়নি। এরপরে মাওবাদী-কংগ্রেস জোট নিয়ে সন্দেহ থাকে কি?

দিদিই চেনেন বাঙ্গালিকে

হে বাঙ্গালি,

আপনাদের সঠিক চেনেন আমাদের দিদি। আপনারা ঠিক যতটা বিনোদন চান ততটাই উনি বোঝেন। আর তাই ছুটি, দিঘা, পুজো, মেলা নিয়ে আপনারা বেশ আছেন।

আর আপনাদের রসলিপ্সা বুঝে দিদির কৃতিত্বে সত্যিকারের পুজো-পাগলরা সাইডলাইনের বাইরে। প্রতিমা, মণ্ডপও গৌণ। চোখ ঝলসানো আলো, দশ দিন ধরে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে পাড়ার লোকের ঘুম তাড়ানো আর বাড়ির বারান্দা-জানালার সামনে হোর্ডিংয়ের ব্যারিকেড তুলে দেওয়াটাই পুজো। মাথায় স্থানীয় নেতারা। কোথাও কোথাও মন্ত্রীরা। নামেই শুধু সর্বজনীন।

এই রাজ্যে দেখুন সবার মুখে সারাক্ষণ কেবল নেই নেই রব। রাজ্য সরকারের কর্মীদের ডিএ বাড়ে না টাকার অভাবে। ঝাঁ চকচকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিকাঠামো নিয়ে পড়ে রয়েছে, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীর নিয়োগ হয় না টাকার অভাবে। জেলায় জেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের ভবন সম্প্রসারণ হচ্ছে না স্রেফ টাকার অভাবে। টাকার অভাবে যে সেতুর মেরামতি হয় না তার উদাহরণ মাঝেরহাট।

অথচ এই রাজ্যেই 'অপচয়' উৎসবের শেষ নেই। আর সেটা আবার সরকার পরিচালিত। ক্লাবের জন্য টাকা। দরাজ হাতে টাকা বিলোনো হয় উৎসবের জন্য। এবার টাকা দেওয়া হয়েছে পুজোর জন্যও। শুধু পুজো কমিটিগুলির জন্য দশ হাজার টাকার অনুদানই নয়, এর থেকেও বেশি টাকা সরকার খরচ করছে পুজোর জন্য।

রাস্তাঘাট মেরামত করে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা, জঞ্জালমুক্ত রাখা, দর্শনার্থীদের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার নির্মাণ করা, ইত্যাদি কাজে যদি খরচ করা হতো তা হলে এই লেখারই প্রয়োজন হতো না। আসলে পুজোয় করদাতাদের কাছ থেকে আদায় করা টাকার একটা বড়ো অংশ স্রেফ জলে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। কোন যুক্তিতে, সে প্রশ্নের জবাব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে মিলবে না। রেড রোডে বিসর্জনের কার্নিভালে কত টাকা খরচ হয় তার হিসেব পূর্ত দপ্তরের কাছে চাইলে তারা বলে অর্থ দফতরের কাছে ফাইল রয়েছে। তখন অর্থদপ্তর স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দেখিয়ে দেয়, আর স্বরাষ্ট্র দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকে। আর সেখানে প্রশ্ন শোনার মতো কানটাই নেই।

এতেই কি শেষ নাকি! রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কারের ব্যবস্থা। বিশ্ববাংলার পুরস্কার। কলকাতার পুজো, জেলার পুজোকে পুরস্কারের ব্যবস্থা। তাতে বিচারকদের ঘুরে বেড়ানো, খাওয়াদাওয়ার তো একটা বড়ো খরচ আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার। কলকাতা পুরসভা দেয় পুরশ্রী পুরস্কার। তার ব্যয়ভার মেটায় একটি বেসরকারি সংস্থা। এই খাতে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে যে সংস্থাটি পুরসভাকে সাহায্য করে, তার বিনিময়ে পুরসভার কাছে তারা কোনও সুযোগ নেয় কি না, নাগরিকরা সেকথা জানেন না।

এবার এ সবের সঙ্গে যোগ হলো পুজো কমিটিগুলিকে অনুদানের জন্য ধার্য ২৮ কোটি টাকা। শুধু তাই-ই নয়, পুজোয় বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুৎ বিলে শতকরা ২৩ ভাগ ছাড় দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় ছাড়ের পুষিয়ে নেওয়ার অন্য ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু জেলায় সব দায়ভারই গিয়ে পড়েছে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের উপরে, অর্থাভাব যার নিত্যসঙ্গী। বিদ্যুতের সারচার্জে ছাড় দেওয়ায় তাদের কতটা ক্ষতি হবে সেই হিসেব এখনও স্পষ্ট নয়। এক একটা পুজোয় যখন এক কোটি টাকার মতো ব্যয় হচ্ছে, তখন তাদের জন্য এত ছাড় কেন?

না, প্রশ্ন করবেন না। কারণ, আপনারা এটাই পছন্দ করেন। তাই তো দিদির এত আয়োজন। এই চিঠি লেখার সময়ে কলকাতায় সিনেমা মেলা হচ্ছে। একটু একটু শীত পড়েছে। আসছে মেলার সিজন। বইমেলা থেকে পিঠে মেলা সব হবে। এই বছরই তো ফুচকা মেলা শুরু হয়েছে। রসোগোল্লা দিবস পালিত হচ্ছে। এত রস থাকলে আর কি চাই বাঙ্গালির।

ভালো থাকুন বাঙ্গালি।

—সুন্দর মৌলিক

ব্যভিচারের আইনগ্রাহ্যতা ও নৈতিকতা

অতিথি কলম

শারধী রাজ

বিবাহবহির্ভূত যা কিছু শারীরিক সম্পর্ক যাকে ব্যভিচার আখ্যায়িত করা হচ্ছে তা কিন্তু কেবল আইনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সমাজের মধ্যে এই বিষয়ে তর্ক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। যার মাধ্যমে বোঝা যাবে এই ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা কী কী মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এখন কোনও শাস্তিমূলক অপরাধ নয়। সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি ৪৯৭ ধারা রদ করে দিয়েছে। এই সূত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা মেয়েরা পুরুষের থেকে আলাদা। আমরা নিজেদের অধিকারগুলি সংরক্ষিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আমাদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে চাই। সংবিধানে আমাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের জায়গাটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ঠিক আছে, ধরে নেওয়া যাক এই দাবিগুলি সম্পর্কে সকলে একমত। এই সূত্রেই আর একটা বিষয়কে আমাদের আলোচনার পরিধির মধ্যে আনতে হবে। এখন দেশে নারী কল্যাণের আইনে অগণিত ধারা বলবৎ রয়েছে। তাহলে আইনের দ্বারা অনুমোদিত এই বিশেষ অধিকারগুলির সুফল ভোগ করছে কারা? আর ঠিক কখন কীভাবেই বা সেগুলির প্রয়োগ হচ্ছে? এই ধরনের প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক।

বিস্ময়কর ভাবে দেখা যায় যেসব মেয়ের উপকারের জন্য এই আইনি ধারাগুলি নির্দিষ্ট এগুলি তাদেরই কোনও কাজে আসে না। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনের ধারাগুলির অপব্যবহারই হয়। এর মধ্যে আবার ৪৯৮-এ নামের ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারাটির যথেচ্ছ কুপ্রয়োগ নজরে পড়ার মতো।

উল্লেখিত বিষয়টি ছাড়াও সর্বোচ্চ আদালত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত বা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকা এখন আর অপরাধ নয়। ৪৯৭ ধারাকে রদ করে দেওয়ার সঙ্গে আদালত এও বলেছে এটি সংবিধান বিরোধী। এই রায়ের সারাংশ হচ্ছে একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীর মালিক নন। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা গালভরা ও মেয়েদের স্বপক্ষে মনে হলেও আদতে সত্যি কথাটা অন্যরকম। এর পেছনে একটি কারণ আছে। ৪৯৭ নং ধারা অনুযায়ী যদি কোনও বিবাহিত পুরুষ অন্য কোনও বিবাহিতা নারীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকেন সেক্ষেত্রে তাঁর জরিমানা সহ বা জরিমানা ছাড়া ৫ বছর অবধি কারাবাসের নিদান রয়েছে। কিন্তু যে নারীটি এই সম্পর্কের অংশীদার ছিল তার কোনও শাস্তির বিধান এই ধারায় ছিল না।

লিঙ্গ ভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিত ধরে আইন :

উল্লেখিত আইনে শাস্তি থেকে মেয়েদের পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর কারণ অনাদিকাল থেকে এমনটাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে পুরুষরাই চিরকাল মেয়েদের নীতিভ্রষ্ট করে, কুমন্ত্রণা দেয়। মেয়েরা বরাবরই নিরীহ থেকে শিকার হয়ে পড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি কোনও মেয়ে কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে ও চিহ্নিত হয় তাহলেও আইনে তার কোনও শাস্তি হবে না। এই আইন অনুযায়ী লিঙ্গ নিরপেক্ষ সমতা কি বজায় রইল? দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার প্রতিবিধান হিসেবে কেবলমাত্র একজনই শাস্তি পাবে। অথচ আর একজন সেই সম্পর্কের অংশীদার যে অকাতরে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল তাকে নিরপরাধ বলে ধরে নিয়ে কোনও শাস্তি দেওয়া হলো না। যে কেউ বলতে পারে যে এক্ষেত্রে কোনও সমতা বজায় রইল না। নারীর সম্মতি বিনা যৌন মিলন হলে তাকে ধর্ষণ বলা হবে। কিন্তু যদি তার অনুমতি নিয়ে যৌন মিলন ঘটে সেক্ষেত্রেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে? এটি কী ধরনের আইন? সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নং ধারাকে এই বিধি লঙ্ঘন করছে না? সংবিধান অনুযায়ী আইনের চোখে সকলেই সমান বলে যে আপ্তবাক্য প্রচলিত তা এখানে এসে কেন মুখ থুবড়ে পড়ল। এই নির্দিষ্ট ধারাটিতে আরও একটা বিষয় বিবেচনাধীন রাখা দরকার। ৪৯৭ ধারা মোতাবেক একজন স্বামীর তার স্ত্রীকে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত থাকার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্ন করার আইনসঙ্গত অধিকার রয়েছে, কিন্তু এই অনৈতিক ঘটনা সত্যি হলেও স্ত্রী থাকবেন নিরপরাধ। শাস্তি হবে কেবলমাত্র তাঁর পুরুষ পার্টনারের। কিন্তু যে স্বামী অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে আছে তার স্ত্রীকে বৈধভাবে স্বামীর ব্যভিচার সম্পর্কে

কোনও প্রশ্ন করার আইনি অধিকার কিন্তু ছিল না। স্ত্রীর কাছে কেবলমাত্র বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা রাখা হয়নি। আজকের দিনেও যে কোনও অবৈধ সম্পর্কই সিভিল অর্থাৎ অপরাধমূলক নয় এমন বিচ্যুতি বলেই ধরা হয়। তাই এই ভিত্তিতেই স্বামী বা স্ত্রী যে কেউই বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারেন। মূলকথা দাঁড়াল একজন স্বামী সব সময় তাঁর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে হাজারো প্রশ্ন করার অধিকারী, কিন্তু স্বামীর অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে স্ত্রীকে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে। আদতে এটা কী সংবিধানের ১৪ নং ধারার বিরোধী নয়।

এই রায় আইনগত সমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সঠিক। কিন্তু আমাদের দেশে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানগত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে সৌমিত্রী বিষ্ণু ও ভারত সরকারের মামলার দিকে নজর দিলে। এই মামলায় সৌমিত্রী অভিযোগ করেছিল যে, ধারা ৪৯৭ সংবিধানের ১৪ ও ১৫ (১) নং ধারাকে লঙ্ঘন করছে। ১৪ নং ধারা অনুযায়ী সকলের সমানাধিকার। আর ধারা ১৫ (১) বলছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ বা জন্মস্থানভিত্তিক কোনও বৈষম্য করা চলবে না। সেই সময় সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল ধারা ৪৯৭ এই দুটি অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করছে না, কেননা পুরুষই সব সময় কুমন্ত্রণাদাতা হিসেবে গণ্য হয়। নারী হয়ে থাকে তার শিকার বা victim, যে কারণে নারীর শাস্তি বিধান করা অবান্তর। সে কখনই দায়ী নয়। এই কারণেই মেয়েদের আইনগত কোন অধিকার থাকে না প্রশ্ন করার। একই ধরনের ফয়সালা হয়েছিল রেবতী ও ভারত সরকারের মামলায়।

বিষয়টা এটাই সিদ্ধ করে যে একজন পুরুষই জন্মগতভাবে দোষী, অন্যদিকে অপরাধ করলেও নারী থেকে যান নির্দোষ। তাঁর কোনও শাস্তি হয় না। বর্তমান রায় এই দীর্ঘদিনের চলে আসা গোছের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আইনের ওপর ইতি টেনে দিল। একজন পুরুষকে বরাবরের জন্য অপরাধী ঠাওরানো মোটেই ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়। যেমন একজন নারীকেও সবসময়ই তিনি ঠিক এমনটা ধরে নেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়।

আইনের সমভাব ও সামাজিক পরিসর :

সকলেই জানেন ফৌজদারী অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও অবৈধ সম্পর্ক কী অতীত কী বর্তমান সর্বদাই সক্রিয় ছিল ও আছে। এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, যেহেতু এটা ফৌজদারী অপরাধ তাই কেউই এপথে পা বাড়াবে না। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও অপরাধ বরাবরই সংগঠিত হয়ে এসেছে। হাতের কাছেই উদাহরণ রয়েছে। পতিতাবৃত্তি অপরাধ হলেও সমাজ থেকে রেড লাইট এলাকা বা নিষিদ্ধ পল্লী কি অবলুপ্ত হয়ে গেছে? দেখা যায়, অপরাধ নির্বিঘ্নে ঘটে চলেছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে এ নিয়ে অভিযোগ করেনি।

অনেকে মনে করেন এই রায়ের মাধ্যমে সমাজকে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। গ্রামাঞ্চলে বাস্তবে যদি কোনও বিবাহিত মহিলাকে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে মহিলার স্বামী সর্বসমক্ষে তাকে পেটাবে। গ্রামবাসীরা সকলেই মহিলার ওপর তুমুল খেপে যাবে। আমরা আকছারই দেখে থাকি বা খবরে পড়ি অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত মানুষজনকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে, কাপড় চোপড় খুলে নিয়ে পথ প্রদক্ষিণ করানো হচ্ছে। Honour killing-এর সংখ্যাতেও কমতি নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে,সাধারণ মানুষ কাকে ভয় পায়? আদতে তার ভয়ের কারণ কি আইন, না তাকে ঘিরে থাকা সমাজ।

“আমরা আকছারই দেখে থাকি বা খবরে পড়ি অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত মানুষজনকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে, কাপড় চোপড় খুলে নিয়ে পথ প্রদক্ষিণ করানো হচ্ছে। Honour killing-এর সংখ্যাতেও কমতি নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে সাধারণ মানুষ কাকে ভয় পায়? আদতে তার ভয়ের কারণ কি আইন, না তাকে ঘিরে থাকা সমাজ।”

রম্যরচনা

পল্টু একটা প্রশ্ন করেছিল।

প্রশ্নটা এই— আচ্ছা, এবার কি ভাইফোঁটার পরদিন ভাইদের নিয়ে রেড রোডে কার্নিভাল বেরবে?

পল্টুকে পরদিন পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

* * *

কিন্তু পল্টু তাতেও থামবার পাত্র নয়।

থানায় পৌঁছেই বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করল--- শুনলাম, কালীঘাটের দিদি নাকি ঘরের বাইরে পা রাখতে পারছেন না।

বড়বাবু তো অবাক। জানতে চাইলেন— কেন?

পল্টুর উত্তর— এত বোনেরা যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়েছে তাই... এরপর পল্টুর কী হয়েছে জানা যায়নি।

উবাচ

“টাকা নয়ছয়ের মামলায় যারা জামিন নিয়ে জেলের বাইরে রয়েছে, তারাই অন্যের নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধীর তোলা অভিযোগ সম্পর্কে

“কংগ্রেস চায় না অযোধ্যায় রামমন্দির হোক। কংগ্রেসকে আগে স্পষ্ট করতে হবে তারা কার ভক্ত। ভগবান রামের, না মোঘল সম্রাট বাবরের।”

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ

রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে কংগ্রেসের দ্বিচারিতা প্রসঙ্গে

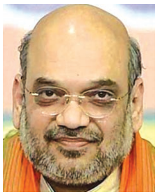

“পঞ্চায়েত স্তর থেকে সংসদ পর্যন্ত বিজেপিকে আরও তিন দশক ক্ষমতায় থাকতে হবে। তাহলেই ভারতকে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।”

অমিত শাহ
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে

“যেসব কাশ্মীরি যুবক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিতে নাম লিখিয়েছে, তারা আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। জঙ্গিদের সঙ্গে থাকলে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে।”

বিপিন রাওয়াত
সেনাপ্রধান

পাঠানকোটে সম্মান সমারোহে দেওয়া বক্তব্য

“প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে ভারতীয় সৈনিকরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের বীরত্বের কথা তুলে ধরতে কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করব।”

ভেঙ্কাইয়া নাইডু
উপরাষ্ট্রপতি

ফ্রান্সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে

মমতা-রাহুলের সর্বভূতে সঙ্ঘদর্শন

সাধন কুমার পাল

বেশ কিছুদিন হলো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সর্বভূতে আর এস এস দর্শন হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ঝামেলার জেরে কয়েকশো সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন প্রতিবাদী ছাত্র রাজেশ ও তাপসের মৃত্যু হলো। রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় মানুষ যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বক্তব্য পুলিশ সরাসরি গুলি করেছে। ফলে ঝরে গেছে দুটি তরতাজা প্রাণ। তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতালিতে। সেখান থেকে তিনি বলে দিলেন পুলিশ গুলি করেনি। গুলি চালিয়েছে আর এস এসের লোকেরা। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চাটার্জির বক্তব্য শুনেও মনে হলো কলকাতায় বসে তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর মতোই দেখতে পেলেন আর এস এসের লোকেরাই গুলি চালিয়েছে। পার্থবাবু এক ধাপ এগোলেন, বললেন, ইসলামপুরে স্কুলেই নাকি এই ঘটনার ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

ঘটনার কয়েকদিন পর কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে গুলি খেয়ে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল আশ্রিত এক দুষ্কৃতীর। প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই জলিল আহম্মেদ-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা বললেন এই হত্যাকাণ্ড আর এস এস ঘটিয়েছে। দার্জিলিংকে শান্ত করার নামে বিমল গুরুংকে শিক্ষা দিতে গিয়ে পুলিশি অভিযানের সময় অন্তত ডজনখানেক আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছিল। তখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি করেছিলেন পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কাদের গুলিতে এতগুলি মানুষের মৃত্যু হলো? আন্দোলনকারীরা কী নিজেরাই নিজেদের দিকে গুলি চালিয়েছে? এক বছর হতে চলল মানুষ দার্জিলিংয়ের এই ঘটনা ভুলতে বসেছে। তবুও কিন্তু গুলি চালানোর ঘটনার কিনারা হলো না এবং রাজ্য সরকার এই গুলি রহস্য উদঘাটনে কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারস্থও হলো না।

১৩ অক্টোবর ২০১৭, পরিকল্পনাহীন পুলিশি অভিযান চালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় অমিতাভ মালিক নামে এক পুলিশ ইনস্পেক্টরের। ঘটনার পরেই চেনা স্টাইলে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় বসেই বলে দিলেন, বিমল গুরুংয়ের লোকেদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে পুলিশ ইনস্পেক্টরের। বিমল গুরুং বিবৃতি দিয়ে দাবি করেছিলেন এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে ইনস্পেক্টর অমিতাভর। এক বছর হয়ে গেল এখনো কেউ জানে না প্রকৃত খুনি কারা।

গত ২ অক্টোবর উত্তর চব্বিশ পরগনার দমদম থানা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে ৮ বছরের শিশু বিভাস ও তার মায়ের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন প্রায় এক ডজন মানুষ। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় দমদম পুরসভার পৌরপ্রধান পাঁচু রায় বলেন ওকে মারতেই নাকি এই আয়োজন। এর পিছনে রয়েছে আর এস এস-বিজেপি। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষ বলছে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্যই এই খুন। এন আই এ কিংবা সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা এই বিস্ফোরণের তদন্ত করলে সামনে কী আসবে তার উত্তর ভবিষ্যৎ বলবে। তবে রাজ্যের সংস্থা সিআইডি তদন্তের আভাস ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট যে, এই বিস্ফোরণ কাণ্ডে আলকায়দা কিংবা বাংলাদেশি কোনও জঙ্গি সংগঠন জড়িয়ে আছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে রাজ্য জুড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। এখন রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিনই খুনজখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি নেতা-নেত্রী পর্যন্ত এই সমস্ত ঘটনায় আর এস এসের হাত দেখতে পাচ্ছেন। এর আগে রায়গঞ্জের ঝামেলা, বীরভূমে বোমা বিস্ফোরণে তৃণমূল কার্যালয় উড়ে যাওয়ার পেছনেও বহিরাগতদের হাত থাকার কথা বলা হয়েছিল।

যুগে যুগে মঠমন্দির বা কোনও বিশেষ ধর্মগুরুকে আঘাত করে হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করা যায়নি, কারণ হিন্দুর সমাজের প্রাণকেন্দ্র অগণিত। একটি ধ্বংস হলে আরেকটি থেকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ঠিক তেমনি হিন্দুসংগঠন হিসেবে আর এস এসের প্রাণকেন্দ্রও ছড়িয়ে আছে হিন্দু সমাজের সর্বত্র। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির মতো রাজনৈতিক দল আসবে যাবে, কিন্তু হিন্দু সমাজ যতদিন থাকবে, দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ যতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখবে, ততদিন আর এস এসকেও ধ্বংস করা যাবে না।

তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিতেই যে আর এস এস-কে দেখতে পাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। গঠনমূলক কার্যক্রমগুলিতেও আর এস এসের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। যেমন সম্প্রতি বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বললেন, বেলুড় মঠ দখল করে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শিকাগোতে তিনি ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ বা কারা চক্রান্ত করে তার যাত্রা ভঙ্গ করেছে। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের মাঝে দাঁড়িয়েও তিনি আর এস এসের সক্রিয় উপস্থিতি এমন ভাবে অনুভব করলেন যে সেটা প্রকাশ না করে পারলেন না। আর এস এসকে দোষারোপ করার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা বা আতঙ্ক যে কারণেই হোক ভুলও বকছেন। যেমন কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র কোনওদিনই

রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে ছিল না। এটা সম্পূর্ণ ভাবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে।

২ অক্টোবর বেলেঘাটার গান্ধী ভবনে এক অনুষ্ঠানে তৃণমূলনেত্রী বললেন, কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে বা ভাষণ দিয়ে এমন ভাবে দেখায় যে, তারা গান্ধীজীর আদর্শ পালন করেন। কিন্তু গান্ধীজী যখন বেঁচে ছিলেন তখন তারা গান্ধীজীর আদর্শ মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীনতার পরের বছর গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান গান্ধীজী। তাঁর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে আর এস এসের সমর্থক ছিল বলে অভিযোগ, যে সংগঠনের ভাবধারায় পোষিত কেন্দ্রের শাসক দল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এক সময় আর এস এসের প্রচারক ছিলেন। শুধু মমতা ব্যানার্জি নন, রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে বামপন্থী নেতাদেরও সর্বভূতে আর এস এস দর্শন হতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিংহ তো ২৬/১১-র মুম্বই হামলা থেকে শুরু করে দেশের ভিতর সমস্ত ঘটনা, সরকারি সিদ্ধান্ত সবেতেই আর এস এসের হাত দেখতে পান। রাহুল-মমতার মতো পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদেরও সর্বভূতে আর এস এস দর্শন হচ্ছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি সৈয়দ ওয়ারিছ অভিযোগ করেছেন, ভারতে এখন মুক্ত চিন্তার কোনও স্থান নেই। বিজেপির আদর্শগত মেন্টর আর এস এস ওদের কেন্দ্রগুলি থেকে ফ্যাসিজম ছড়াচ্ছে। সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের মুখে আর এস এসের সমালোচনার ভাব ও ভাষা হুবহু মমতা ব্যানার্জি ও রাহুল গান্ধীদের মতোই।

প্রশ্ন হচ্ছে— মমতা ব্যানার্জি, রাহুল গান্ধী ও পাকিস্তানি নেতাদের সর্বভূতে আর এস এস দর্শন হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। এক ভয়, দুই ভক্তি। ভক্তি থেকে যে এদের আর এস এস দর্শন হচ্ছে না, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মনস্তত্ত্ব বলছে কোনও কিছু থেকে প্রচণ্ড ভয় পেলে সেই ভয়ের বস্তুটি কিন্তু শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে সর্বত্রই সর্বভূতে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। পুরাণেও এর দৃষ্টান্ত আছে। সর্বোচ্চ প্রয়াস করেও হত্যা করতে না পেরে কংস শ্রীকৃষ্ণকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটিই, হত্যা করা। রাজসভায় প্রবেশের আগে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত হাতি, পরে যমদূত সম পালোয়ানদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে এদের পরাজিত করে রাজসভায় প্রবেশের পর কংস হাতে তরবারি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলেন। যেদিকে তাকাচ্ছেন সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ। রাজসভায় উপস্থিত মানুষ, আসবাব, ঘরের দেওয়াল, খুঁটি সর্বত্রই সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় আঘাত করবেন? এত শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন যে কোনটা আসল সেটাই বুঝতে পারছেন না। ফলে পাগলের মতো যেখানে সেখানে আঘাত করতে গিয়ে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের হাতেই প্রাণ দিলেন। রাহুল মমতারও অবস্থাও যেন অনেকটা একই রকম। বিজেপি, কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, এবিভিপি, বিদ্যাভারতীর স্কুল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ, বজরং দল, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, বিভিন্ন মঠ মন্দির সর্বত্র আর এস এস দর্শন হচ্ছে। এদের মধ্যে কোনটা আসল আর এস এস? ঠিক কোথায় আঘাত করলে খতম বা দুর্বল করে দেওয়া যাবে এই সংগঠনকে? কখনো মনে হচ্ছে বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলিই আসল জায়গা। এখানেই লুকিয়ে আছে আর এস এসের প্রাণ। সুতরাং স্কুলগুলি বন্ধ করতে পারলে আর এস এস খতম। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যেখানেই আর এস এসের উপস্থিতি আছে বলে মনে হচ্ছে সেখানেই এই সংগঠনটিকে খতম করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে আঘাত হেনে যাচ্ছেন। এই ধরনের আঘাত হানার ঘটনা এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে সেটা অনেক সময় দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপে পরিণত হচ্ছে। 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' লড়াইয়ের এই চেনা ফর্মুলা ধরে দেশের ভিতরে ক্রিয়াশীল ইসলামিক মৌলবাদ, মাওবাদী, কাশ্মীরি উগ্রপন্থী এবং দেশের বাইরে ক্রিয়াশীল ভারতের শত্রু বলে চিহ্নিত চীন বা পাকিস্তানের মতো দেশের সঙ্গেও মমতা ব্যানার্জি রাহুল গান্ধীরা এখন নৈকট্য অনুভব করছেন। কারণ ভারত বিরোধী এই সমস্ত শক্তি দেশে যত বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে ততই ক্ষমতাসীন বিজেপি কিংবা নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি খারাপ হবে, সম্ভাবনা বাড়বে কংগ্রেসের। দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপজাত পরিস্থিতির রাজনৈতিক লাভের আশায় মমতা, রাহুল গান্ধীরা এমন পর্যায়ে গেছেন যে এই রাজনীতিকরা এখন আর এস এস বিরোধিতা, বিজেপি বিরোধিতা ও দেশ বিরোধিতার মধ্যে লক্ষ্মণ রেখাটিই তুলে দিয়েছেন।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। মমতার ডান হাত বলে পরিচিত রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পাকিস্তানের দৈনিক দ্য ডন-এর সাংবাদিক মালিহা হামিদ সিদ্দিকিকে অবলীলা ক্রমে বলে দিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে কলকাতার মিনি পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছি।' কালিয়াচকের থানা জ্বালানো, খাগড়াগড়ের বোমার কারখানা, শিমুলিয়ার মাদ্রাসায় জেহাদি প্রশিক্ষণ, বসিরহাট, বাদুরিয়ার দেগঙ্গার দাঙ্গার ঘটনা প্রমাণ করছে পশ্চিমবঙ্গ এখন ইসলামিক মৌলবাদের প্রয়োগ শালা। ইসলামিক মৌলবাদের দৃষ্টিতে আর এস এস-বিজেপি যতটা শত্রু তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ততটাই শত্রু। ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিয়ে প্রভাব বিস্তার করা জেহাদি শক্তির পুরানো রণকৌশল। সমস্ত বিশ্ব যখন ইসলামিক মৌলবাদের হুমকির মুখে তখন এই সরল সত্য কোনও ব্যক্তিরই না জানার কথা নয়। তবুও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে মৌলবাদীদের আড়াল করে কথায় কথায় হিন্দু সংগঠনগুলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাহুল-মমতার মতো রাজনীতিকরা দুর্বল করে দিচ্ছেন ভারতবর্ষের অস্তিত্বের ভিতটিকে। কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার তো পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীকে হঠাতে ওই দেশের সাহায্য চেয়ে রেখেছেন। গেলাম নবি আজাদ বলেছেন, কাশ্মীরে নাকি সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের তুলনায় সাধারণ মানুষকে বেশি করে মারছে। শশী থারুর তো 'হিন্দু পাকিস্তানের' স্বপ্ন দেখেই রেখেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, লক্ষ্য আর এস এস-বিজেপি হলেও এই ধরনের বক্তব্য যে সরাসরি দেশের স্বার্থের বিরোধী এটা বোঝার ক্ষমতাও কি লোপ পেয়েছে এই নেতাদের?

যুগে যুগে মঠমন্দির বা কোনও বিশেষ ধর্মগুরুকে আঘাত করে হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করা যায়নি, কারণ হিন্দুর সমাজের প্রাণকেন্দ্র অগণিত। একটি ধ্বংস হলে আরেকটি থেকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ঠিক তেমনি হিন্দুসংগঠন হিসেবে আর এস এসের প্রাণকেন্দ্রও ছড়িয়ে আছে হিন্দু সমাজের সর্বত্র। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির মতো রাজনৈতিক দল আসবে যাবে, কিন্তু হিন্দু সমাজ যতদিন থাকবে, দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ যতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখবে, ততদিন আর এস এসকেও ধ্বংস করা যাবে না। ■

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্লোগান ছাড়া কিছু নয়

সনাতন রায়

গত বছর দুয়েক ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার উন্নয়নের দাবি তুলে গগন ফাটাচ্ছে রাজ্য সরকারের ধামাধারী অর্থনৈতিক মদতপুষ্ট রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজরা এবং সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভিক্ষে (সরকারি বিজ্ঞাপন)-র আশায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো সংবাদ মাধ্যমগুলিও 'বাবু যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'-এর মত উন্নয়ন উন্নয়ন করে শোরগোল তুলেছে। একেবারে সাত সকালের মাছের বাজারের মতো। উন্নয়নটা কেমন? এক এক করা বলা যাক।

১। মূলত দক্ষিণ কলকাতা, কিয়দংশে উত্তর কলকাতা এবং কোনও কোনও মফস্‌সল শহরের পার্কগুলি অল্পবিস্তর সেজেগুজে উঠেছে।

২। রাস্তায় ঘটা করে বসানো হয়েছে ত্রিফলা আলো। আর ল্যাম্প পোস্টগুলিতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নীল সাদা রঙের এলইডি আলো।

৩। গাঁয়ের রাস্তাঘাটগুলো কংক্রিটে মোড়া হয়েছে। পিচ পড়ছে যান চলাচলের রাস্তায়।

৪। গুচ্ছের বিশ্ববিদ্যালয় ভবন হয়েছে।

৫। গুচ্ছের মালটিস্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে।

৬। দু-চারটে স্টেডিয়াম হয়েছে।

৭। দু-চারটে ফ্লাইওভার হয়েছে।

৮। সরকারি ভবনগুলি নীল সাদা রঙের চাদরে মোড়া হয়েছে।

৯। সরকারি অনুদানের টাকায় বিভিন্ন ক্লাবের টালির চাল কংক্রিটের ছাদ হয়েছে, নয়তো বছরভর জলসা হয়েছে।

১০। আর বাকিটা হলো উৎসবের ঘোর ঘনঘটা। কচু উৎসব থেকে ইলিশ উৎসব।

এসবই দৃশ্যত প্রতীয়মান। তবে এটাও উল্লেখ করা দরকার যা হয়েছে সবই কসমেটিক্স চেঞ্জ। অর্থাৎ পাউডার মাখিয়ে কালো মেয়েকে ফর্সা করার অদম্য প্রচেষ্টা। তাও সাময়িক। কারণ, গুনে গুনে বলা যাবে, অর্ধেকের বেশি পার্ক জঙ্গলে ভরেছে। অর্ধেকের বেশি ত্রিফলা রাস্তা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেছে। গাঁয়ের রাস্তাঘাটের কংক্রিটের রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। কারণ কারিগরি বিজ্ঞাপনের নিয়ম মেনে তারের জাল ছাড়াই কংক্রিট ঢালাই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড আছে। পরিকাঠামো নেই। মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকেও পরিকাঠামোর অভাবে রোগীকে ফিরে আসতে হয়। স্টেডিয়াম হলে খেলাধুলোর পরিকাঠামো গড়া হয়নি। নতুন ফ্লাইওভার যেমন হয়েছে, তেমনি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দু-চারটে পুরনো ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ে মানুষের প্রাণও গেছে। এর নাম যদি উন্নয়ন হয়, তাহলে অর্থনৈতিক অভিধান থেকে উন্নয়ন শব্দটাকে মুছে দেওয়াই মঙ্গল।

উন্নয়ন জ্ঞাপন বিশারদ নোভা সি কুইব্রাল (Nova C. Quebral) উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাষায় : "Speedy transformation of a country from poverty to dynamic state of economic growth that makes possible greater economic and social equality and the larger fulfillment of the human potential."

এক্ষেত্রে উন্নয়নের শর্তগুলি দাঁড়ায় এরকম :

১। দারিদ্র দূরীকরণ, ২। দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ৩। সামাজিক সাম্য, ৪। মানব সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার। ইউনিসেফ ১৯৯৭ সালে এগুলিকেই উন্নয়নের শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউনিসেফও স্পষ্টতই ঘোষণা করেছে :

The progress of Nations is to be lodged not by their military or economic growth, not by splendour of their capital cities and public holdings but by the well being of their peoples : by their laves of health, nutrition and education, by their opportunities to earn a fair reward for their labours, by their ability to participate in the decissions that affect their lives by the respect that is shown for their civil and political liberties, by the provision that is made for those who are vulnesable disadvantaged and by the protection that is afforded to the growing minds of their children."

অর্থাৎ শুধুমাত্র মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি)-এর মাপকাঠিই নয়, জীবনের উৎকর্ষ সাধনই হলো প্রকৃত উন্নয়ন। অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং সূক্ষ্ম মূল্যবোধের গঠন— এই দুটি স্রোতের স্বাভাবিক বহমানতাই হলো উন্নয়ন। উন্নয়ন মানে : (১) কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি, (২) শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি, (৩) শিক্ষার প্রগতি, (৪) স্বাস্থ্যের প্রগতি, (৫) বেকারত্ব দূরীকরণ, (৬) আয়ের সমবণ্টন, (৭) দুর্নীতি রোধ, (৮) সামাজিক প্রগতি, (৯) রাজনৈতিক মত ও পথের সম অবস্থান, (১০) আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা, (১১) উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, (১২) উন্নয়ন জ্ঞাপন ক্রিয়াকে মজবুত করা, (১৩) মানুষের আত্মমর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া, (১৪) মানুষের স্বাধীনতা বোধকে সম্মান জানানো, (১৫) সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে উন্নয়নের প্রকৃত শর্তগুলি মেলাতে বসলেই যে কোনও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারবেন, উন্নয়ন বলতে রাজ্য সরকার আর তার পারিষদরা যা বোঝে তা আসলে মূর্খের স্বর্গবাসেরই সমান।

রাজ্য সরকার দাবি করে, ৮০ লক্ষ বেকারের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। হিসাব চাইলে রাজ্য সরকার মুখে কুলুপ আঁটে। রাজ্য সরকার দাবি করে, কন্যাশ্রী প্রকল্পে তারা বিশ্বের এক নম্বরে। যখন হিসাব চাওয়া হয় বিনি পয়সায় সাইকেল দেবার পরেও স্কুলে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল কত শতাংশ, রাজ্য সরকার তখন কানে তুলো গোঁজে। রাজ্য সরকার দাবি করে, রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির জন্য বিনামূল্যে ভাত আর ডিমের ঝোল দেওয়া হয়। প্রত্যেকে পান গোটা ডিম। প্রকৃত চিত্রটা কী? কোথাও ডিম মেলে সপ্তাহে দুদিন। কোথাও পাঁচদিন, কিন্তু আধখানা করে। সঙ্গে শুধুই আলুর ঝোল। বিনি পয়সার আসল ভোজটা হচ্ছে নেতাদের ঘরে ঘরে সরকারি লুটের পয়সায়।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের দাবি যদি মানতেই হয় তা হলো প্রশ্ন তুলতে হবে—

(১) রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন মাথাপিছু কত ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করছেন?

(২) মাথাপিছু বসবাসের উপযোগী ঘরের সংখ্যা কত?

(৩) জনপ্রতি পরনের কাপড় জোটে কত গজ?

(৪) গ্রামের তাঁতিদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে?

(৫) কত হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে? ফসলের পরিমাণ কত?

(৬) কৃষক পরিবারগুলিতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত?

(৭) ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কত?

(৮) ১৪ বছর পর্যন্ত স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বার্ষিক গড় হিসেবে কত?

(৯) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা কত? কত মানুষের চিকিৎসা হয় কতগুলি কেন্দ্রে? কত ওষুধ বিতরণ হয়?

(১০) স্বনির্ভর প্রকল্পে উন্নয়নের হিসাব কী?

(১২) রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে কত?

(১৩) কলকারখানায় বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে কতটা?

(১৪) কত কলকারখানা বন্ধ হয়েছে? কত কলকারখানা নতুন করে চালু হয়েছে।

১৫। শিল্পে নতুন বিনিয়োগের মাত্রা কতটা? বিদেশি বিনিয়োগের হিসেব কী?

১৬। রাজ্যে মহিলা নিগ্রহ, ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে কেন?

১৭। রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বাৎসরিক গড় মৃত্যুর সংখ্যা কত?

১৮। রাজ্যে কতগুলি ঘটনায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে? নিহত/ আহতের সংখ্যা কত?

১৯। রাজ্যে শুধুমাত্র উৎসব খাতে সরকারি খরচের পরিমাণ কত? আয় কত?

২০। মুখ্যমন্ত্রীর সপারিষদ বিদেশ ভ্রমণে ব্যয় কত? লাভ কতখানি?

মানুষের অভিজ্ঞতা বলে, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সরকার অভ্যস্ত নয়। কারণ মুখে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান তুললেও, আজকের রাজ্য সরকার খুব ভালোভাবেই বোঝে যে 'মা-মাটি-মানুষ' আজ তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার নয়। উন্নয়নের স্লোগান তুলে, উন্নয়নের নামে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যের নাম বদলে দিয়ে দু' টাকা কিলো চাল, গরিব কন্যার বিয়ের জন্য রূপশ্রী প্রকল্পে আর্থিক অনুদান, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের বিনি পয়সায় সস্তার জুতো আর ইউনিফর্ম দিয়ে বাঙ্গালিকে ভিখারি বানিয়ে রাখা যাবে যতদিন, ততদিনই লাভ।

একথা সত্য, আগের সরকার বামফ্রন্ট শেষের ১০/১৫ বছর উন্নয়নের দিকে সেভাবে নজর দেয়নি। কিন্তু ভুমিসংস্কার আর পঞ্চায়েত ব্যবহারে একটা সুঠাম কাঠামো বানিয়ে দিতে পেরেছিল যাতে আখেরে উন্নয়নের দিশা কিছুটা হলেও দেখা গিয়েছিল। তৃণমূল সরকারের গত সাত বছরে কিন্তু খোলনলচে বদলে গেছে। জোতদাররা ফিরে এসেছে। ফের রাজনৈতিক দাদার ভূমিকায়। পরোপকারী একনায়কের ছদ্মবেশে আজ শাসকদলের ছাত্রছায়ায় উন্নয়নের নামে গলাবাজি করে পাঁচ-কে পঞ্চাশ করে দেখানো হচ্ছে। গ্রামীণ প্রান্তিক অর্থনীতির মানুষ সব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ তাঁদের আজ একমাত্র অবলম্বন সরকারের দেওয়া ভিক্ষাপাত্র। স্বাবলম্বী হওয়ার পরিকাঠামো পৌঁছয়নি তাদের কাছে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়— রাজ্যের গণমাধ্যমগুলির শাসকদলের বাড়ির কাজের লোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। মুষ্টিভিক্ষার মতো দু-চারটে সরকারি বিজ্ঞাপন (তাও তার পয়সা মেলে ৬ মাস/১ বছর পরে) পাওয়ার জন্য নির্লজ্জতা কোন স্তরে পৌঁছতে পারে, এ রাজ্যের গণমাধ্যমগুলি নজির তৈরি করল। সংবাদমাধ্যমের ইতিহাসে এ এক নয়া সংযোজন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেই নয়। কিছু ক্ষমতা, কিছু অর্থ, কিছু উপরি লাভ, সরকারি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার লোভের বশে ব্যক্তিগত স্তরেও বেশ কিছু সাংবাদিক নিজেদের মাথা বিকিয়ে দিয়েছে শাসকদল এবং সরকারের কাছে। সরকারের নির্দেশে তারা আজ দিনরাত ওঠবোস করছে হাসি মুখে। আর মাসের শেষে গুনে দেখছে— কালো টাকার আমদানিটা সাদা করা যায় কীভাবে।

অতএব উন্নয়ন জ্ঞাপন বা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন বলতে যা বোঝায়, তাও স্তব্ধ। কারণ আজকের বাংলার তথাকথিত সাংবাদিকরা হয় 'উন্নয়ন জ্ঞাপন' শব্দদুটির অর্থ বোঝেন না অথবা জানেনই না। তাঁরা বোঝেন নীল সাদা রঙের প্রলেপ আর নীল সাদা আলোর বাহার মানেই উন্নয়ন, মা-মাটি-মানুষের স্লোগান মানেই প্রগতি। এবার কিন্তু শিক্ষিত মানুষের জেগে ওঠার দিন এসেছে। প্রগতিশীল (তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নয়) মানুষদের পথে নামার সময় এসেছে। সময় এসেছে মিথ্যা বোঝাই প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবার। সরকার, শাসকদল, রাজনৈতিক দাদা আর পারিষদ সাংবাদিকদের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে দেওয়ার। সময় এসেছে প্রশ্ন করার— রাজা তোর কাপড় কোথায়? ■

গণতান্ত্রিক অধিকারের আত্মঘাতী সুপ্রিম কোর্ট

অষ্টম কুমার মাঝি

ভোটদান ভারতের জনগণের শুধু সাধারণ অধিকার নয়; মৌলিক অধিকার। ভারতের পার্ট-থ্রিতে এই অধিকার দেওয়া আছে। এই সংবিধান তথা সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব ধারা নং ১৪৪এ বাতিল করা সত্বেও Part-IV Union Judiciary-তে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া আছে। কিন্তু ইদানিং পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের উপর যে রায় দেওয়া হয়েছে সেটি এই দায়িত্ব বহির্ভূত রায়— অন্যায় ও অসাংবিধানিক। এই রায়ে আইন দিয়ে আইনকে চাপা দেওয়া হয়েছে। ঠিক একই রকম রায় দেওয়া হয়েছিল কর্ণাটকের ভোটের উপর। এই রায়ে Natural Justice-কে অবহেলা করা হয়েছে। বাস্তবে Majority শব্দের সঠিক ও মানবিক মূল্যায়ন করা হয়নি। ভোট বিবেকবান মানুষে দেয়। এই ভোটের প্রাঙ্গণে থাকে নানারকম বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা, প্রচার, শোষণ শাসন, উসকানি ধমক ধমকানি। ভোটারদের মধ্যে দ্বিধা সংশয়ও কখনও কখনও জেগে ওঠে। তবুও ভোট পড়ে পছন্দ মতো। জনভোট ভাগাভাগি হয়ে যায়। তবুও এমন একটি সংখ্যা উঠে আসে যা খণ্ড খণ্ড সংখ্যার মধ্যে অধিক হয়। আর সেটিই ভোট সংখ্যার মেজরিটি। জনতা ভোট দিয়ে যে দলকে তুলে ধরে সেটিই জনমতের মেজরিটি। হয়তো তা সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছুতে পারে না। তবুও সেই দলকেই সরকার গঠনের জন্য ডাকা উচিত এবং সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠনের জন্য সময় দেওয়া উচিত। সংবিধানে সম্ভবত ১৫ দিন সময় দেওয়ার নিয়ম আছে। সরকার সেই ভাবেই জনমতে গরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দলকে ডেকেছিল। সময়ও দেওয়া হয়েছিল। এবং গঠন কার্য শুরুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ না করে নির্বাচনোত্তর জোট এসে মাথাচাড়া দিল। প্রাক নির্বাচন চুক্তিহীন জোট হঠাৎ

ঘোড়া কেনাবেচার পাইকারি করে জোগাড় করা কয়েকটি দলের সদস্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করে বসল। রাতারাতি পালটে গেল। সরকার গঠন করবার জন্য ডাকা দলকে দুই থেকে আড়াই দিন সময় দেওয়া হলো না কেন? জোট করা হয় ডাকাতি করবার জন্য। একা একা পারছি না— সবাই মিলে লুটপাট করার সন্ধি। এই ধরনের জোট করার সঠিক সাংবিধানিক প্রাবধান নেই। গণতান্ত্রিক ভাবে জোট করা যায়। তবে তা প্রাকনির্বাচনী জোটবদ্ধতা হতে পারে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ইস্তাহার থাকে বা পদ্ধতিগত ভাবে চলার কথা বলা থাকে। কাজেই কোনও দলের ইস্তেহার অন্য দলের বিপরীত হতে পারে। এক্ষেত্রে জনসেবা বা জনমঙ্গলকর কাজে ইস্তেহারি বৈষম্য কলহের কারণ হয়ে উঠতে পারে। জনসেবা বিলম্বিত ও বিঘ্নময় হয়ে উঠতে পারে। তাই জোটবদ্ধ হওয়ার কাজ প্রাক নির্বাচনেই নির্বাচন কমিশনারের সম্মতি নিয়ে করা উচিত। এই প্রাক নির্বাচনী জোটবদ্ধতা হলে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ইস্তেহারের সমন্বয় সাধন করে সরকার পরিচালনার জোট ইস্তেহার তৈরি করা হয়। এবং জোট সরকারকে অনুমতি দেওয়া যায়। কিন্তু কর্ণাটকের নির্বাচনের জন্য তা করা হয়নি। নির্বাচনোত্তর জোটকে সংখ্যার গরিষ্ঠতার জন্য প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

ভোট শুধু সংখ্যার নয়। ভোট জনমতের আর সেই জন্য জনমতকে প্রাথমিকতা ও মর্যাদা দিতে হবে। জনমত মানুষের বিবেকের ফল। এই বিবেক ও বুদ্ধির ভোটের ফল যে দলকে গরিষ্ঠতা দেয় সেটিই মেজরিটি। সরকার গঠনের সাংখ্যিক গরিষ্ঠতা শুধু আঙ্কিক হিসাব। ভোটের দ্বারা ঘোষিত জনমত যে দলকে গরিষ্ঠতা দেয় সেই দলকে সাংবিধানিক গরিষ্ঠতা দেয় সেই দলকে সাংবিধানিক গরিষ্ঠতায় উত্তীর্ণ করাই সংবিধানের মানবিক সুখ ও অন্তর্নিহিত সত্য। সুপ্রিম কোর্ট শুধুই যদি আঙ্কিক হিসাবকে শিরোধার্য করে পাণ্ডিত্য দেখাতে থাকে তাহলে সেই সুপ্রিম কোর্ট রাখার কী প্রয়োজন? এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট খাকির কা ফকির। মানুষের চেতনা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে মানবিক অধিকার না দেওয়াই উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের উপরও সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি হৃদয়হীন, অসাংবিধানিক রায় ঘোষণা করেছে। এখানে তো সম্পূর্ণ রূপে বিধি দিয়ে বিধানকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ ছিল বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত ভোট অবৈধ। প্রায় একুশ হাজারের অধিক বিরোধী প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলেছে। সরকার সাফাই দিয়েছে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বিরোধী কোনও প্রার্থী

মনোনয়ন পত্র জমা দিতে আসেনি। এই অভিযোগ ও সরকারি সাফাই কোর্টে কোর্টে ঘুরে অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ তথা সাংবিধানিক অধিকারের রক্ষক সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে— পঞ্চায়েত ভোট বৈধ ও সরকার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করতে পারে। এর জন্য পুলিশি সহায়তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে যে একুশ হাজারের অধিক বিরোধী প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি— এ কথা মিথ্যা। কারণ কোনও প্রার্থী অভিযোগ জমা করেনি। কাজেই দুষ্কৃতী তাণ্ডব মিথ্যা। এটাই হলো সুপ্রিম কোর্টের বিধি দিয়ে বিধানকে চাপা দেওয়া।

আমাদের বিচার বিভাগের দুটি ভাগ আছে। প্রথমটি— আইন বা বিধি। দ্বিতীয়টি হলো— পদ্ধতি। এর সঙ্গে আর একটি ভাগ হলো cognizence of offence-এর অধিকার। কিন্তু তা স্পষ্টত দেখা যায় না। যাই হোক আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতিতে রয়েছে যে পদ্ধতিগত ভাবে অভিযোগ না করলে বিচার হয় না। সুপ্রিম কোর্ট সেটি স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করেছে যে বিরোধীদের একুশ হাজার প্রার্থীদের মধ্যে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। তাই সব মিথ্যা। এমনকি সংবাদ মাধ্যম সংবাদ পত্রে, দূরদর্শনে যা প্রচার করেছে তাও ভিত্তিহীন। তাই বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত ভোট বৈধ। ভোট যে হয়নি সেটাও সুপ্রিম কোর্টের নজরে আসেনি। এই ক্ষেত্রে যদি বিচারের বা বিচারকদের অপরাধকে perception বা অনুসন্ধান করার শক্তি ও অধিকার থেকে থাকত, তাহলে এই করা অভিযোগের যৌক্তিক সত্যকে অবহেলা করতে পারত না।

গণতন্ত্র হলো বিরোধীদের খেলার ময়দান। বিরোধীগণ যত আলোচনা সমালোচনা প্রতিযোগিতা করবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ততই উৎকর্ষ পাবে। বিরোধীশূন্য হলে নির্বাচনের ময়দানে জয়পরাজয়ের কোনও প্রশ্নই থাকে না। বরং নির্বাচনের ময়দানে বিরোধী শূন্য হওয়ার অর্থ এক অপমানকর শাসন চরিত্রের পরাজয় ও দুষ্ট চরিত্রের কালা কানুনই শাসকের পরিচয় প্রকাশ করে। নির্বাচন না হওয়ার অর্থ একুশ হাজার বিরোধী প্রার্থীর জন্য প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি ভোটারের ভোটাধিকার ব্যর্থ হওয়া। দ্বিতীয়ত পছন্দের প্রার্থী হলে ভোটারদের ভোট না দেবার অধিকারও তো অধিকার। কে জানে শাসক দলের যতগুলি প্রার্থীকে সুপ্রিম কোর্ট জয়ী বলে বৈধতা দিয়েছে তাদেরকে জনতা পছন্দ না করতেও পারত। ভোট না দিতেও পারত। সম্ভাবনার কথা বলা যায় না। ভোট প্রাপ্তির এমন একটি সংখ্যা আছে সেটি না পেলে প্রার্থীর জমানত জব্দ হয়ে যেতে পারত।

সুপ্রিম কোর্ট কোনও কিছুকেই মানেনি। একুশ হাজার বিরোধী প্রার্থীদের অভিযোগ পত্র না পাওয়ার পরও Cognizance of offence-এর আলোতে জানতে পারত যে দুই থেকে আড়াই কোটি ভোটারের ভোট দেওয়া হয়নি ভোটারদের মৌলিক অধিকার হনন হয়েছে যা সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্ব ছিল রক্ষা করার। সুপ্রিম কোর্ট তো সে পন্থা নেয়ইনি, উল্টে বিনা ভোটে শাসক দলের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষিত করে দিল। এই রায়ে না গণতন্ত্র রক্ষা পেল, না মানুষের fundamental rights-এর রক্ষা হলো।

আমাদের ভারত সরকার চলে চারটি পদ্ধতি বা স্তম্ভের উপর। প্রথম হলো আইন বিভাগ, দ্বিতীয় হলো আইন কার্যকরী বিভাগ, তৃতীয় হলো বিচার বিভাগ এবং চতুর্থ হলো— জনমত। এই চারটি স্তম্ভ চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ জনমত থেকে আইন তৈরি হয়। এই জনমতের মাধ্যম হলো সংবাদমাধ্যম। একেই fourth etates of India বলা হয়। তাই সংবাদমাধ্যমকে সরকার প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সে মান্যতা দিল না। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে দণ্ডায়মান উন্নয়নের দণ্ড যে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, আঘাত প্রত্যাঘাত, নর প্রহার নর নিধনের যে যজ্ঞ হয়েছে সংবাদমাধ্যম দূরদর্শন যা সবার সামনে ছবির মতো তুলে ধরেছে তা কী কুহক মাত্র? সুপ্রিম কোর্টের পদ্ধতিগত ভাবে অভিযোগ করা হয়নি বলে সেসব ঘটনাগুলি কি মিথ্যা? যদি এমন হয় তাহলে জনমতের উপর ভিত্তি করে কোনও গণতান্ত্রিক আইনই তৈরি হবে না। ভোটও দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সুপ্রিম কোর্ট দলের অভিযোগ মতো মনোনীত করে দেবে যে 'এ' দল পাঁচ বছর শাসন কাজ চালাবে, 'এস' দল তাররেরের পাঁচ বছর শাসন কাজ চালাবে, তারপর 'সি' দল পাঁচ বছর শাসন কাজ চালাবে ইত্যাদি। কারণ ভোটকে সুপ্রিম কোর্টের হিসেবে বিরোধীশূন্য হতে হবে।

রামমন্দির এবং শবরীমালা মামলার ক্ষেত্রেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এরকমই অযৌক্তিক, অবিবেচক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

মানুষ আজ পর্যন্ত সবকিছুকে অবিশ্বাস করলেও বিচার বিভাগের উপর চরম আস্থা রাখত। এবার বোধহয় সে আস্থাও আর থাকবে না। বিচার বিভাগ আইনের বিচার করে না, বিচার করে সচেতন, বুদ্ধিমান মানুষের মানসিকতা ও আচার ব্যবহারের। আইনি ধারাগুলি সেই বিচারের পদ্ধতিগত দিক মাত্র অর্থাৎ ফ্রেমওয়ার্ক। পথচলার নির্দেশ মাত্র। পুস্তকে লিখিত আইন অনড়— চলমান মানব জীবনের পথিকৃৎ হতে পারে না। বৈচিত্র্যময় মানব জীবনের সঙ্গীত হতে পারে না। আইন মানব জীবনের সব কথা বা শেষ কথাও নয়। তাই আইন দিয়ে জীবন বিচার করতে গেলে যুক্তি ও সঙ্গত অনুমান দিয়ে অকথিত সত্যকে জেনে নিতে হয়। যদি তা না হয় তাহলে মানব অধিকার ও মানবের মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করা যাবে না। এখন যেমন সুপ্রিম কোর্ট দুই থেকে আড়াই কোটি লোকের ভোট দেবার মৌলিক অধিকারকে হনন হবার হাত হতে রক্ষা করতে অসফল হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট লিভ টুগেদার, বিবাহিত জীবনে পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অপরাধ নয়,— এমন সব উদ্ভট রায় দান করে মানুষের সমাজবদ্ধতাকে আঘাত হানছে, মানুষের সামাজিক সম্বন্ধকে ছত্রছাড়া করে দিচ্ছে। সংবিধানে ব্যক্তিবাদ থাকলেও সমাজ সম্বন্ধ নিয়েই মানুষ শান্তির সঙ্গে বেঁচে আছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে গেলে পরিবারের দেওয়ালও আর টিকে থাকতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় সব বিষয়েই আত্মঘাতী হয়ে উঠছে। ■

চিঠিপত্র

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকার

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পতাকা উত্তোলন ভারতীয় ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নেতাজীর দেখানো পথকে অনুসরণ করে স্বপ্নের ভারত গঠন করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য এ ঘটনা সে কথাকেই প্রমাণ করে। লালকেল্লার এই কর্মসূচিকে অনেকে সমালোচনা করছেন। কিন্তু এই কর্মসূচির মাধ্যমে আজাদ হিন্দ সরকারের ইতিহাস সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা অবশ্যই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বস্তুত ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে ভারতের বাইরে যে রাজনৈতিক ক'টি সংগঠন গড়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ সরকার তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে সামনে রেখে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন নেতাজী। মূলত বিদেশি আক্রমণ ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ সরকার গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনী। আর এই আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান ভারতে ব্রিটিশরাজের ভিতকে দুর্বল করেছিল। ইতিহাস সচেতন মানুষ জানেন যে, নেতাজী ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চরিত্র। দেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী, মহান ও সংগ্রামী নেতাজী ছিলেন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নময় নিষ্কলুষ প্রাণ। এই আপোশহীন ব্যক্তিত্বের মহান্ কীর্তিগুলোকে স্মরণ করে কোনও কর্মসূচি পালন করা অত্যন্ত গৌরবের আর যুক্তিযুক্ত। আর স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতাজীকে স্বীকৃতি দেওয়া ন্যায় বিচার করা হবে। কিন্তু তথাকথিত কিছু নেতা-নেত্রী নেতাজীকে রাজনীতির চক্রব্যূহে টেনে এনে এহেন জাতীয়তাবাদী কর্মসূচিকে ভোটের রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করে আজাদ হিন্দ সরকারকেই কার্যত অস্বীকার করেছেন। মূলত তাঁরা একজন মহান ব্যক্তির মহান অবদানকে খাটো করে দেখেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিনে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজীর অবদানকে সম্মান জানিয়েছেন। এরকম সততা ও সৎ সাহস এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী দেখাতে পারেননি। সেই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রহশালার ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেন। সম্প্রতি বিশ্বের শান্তি, মানবোন্নয়ন ও দেশে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর জন্য সিওল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই নেতাজীর দেখানো পথের দিশারি হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

মন্ত্রিত্বের অমর্যাদা

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন লালুপ্রসাদ যাদবের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই পায়। পরে অবশ্য তা প্রত্যাহৃত হয়। এ জাতীয় কাজ ক্ষমতার অপব্যবহার তো বটেই, স্বৈরাচারী মানসিকতার লক্ষণ বলে প্রকাশ পায়। একই ভাবে, মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন ডক্টরেট হওয়া, সাম্মানিক ডক্টরেট পাওয়া, নিজস্ব গান সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রচার প্রশাসনের দুরবস্থা এবং নিরপেক্ষহীনতাকেই প্রকাশ করে। প্রমাণ করে দুর্বলব্যক্তির রাজক্ষমতায় থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করা। রাজসেবী বুদ্ধিজীবীরা যুগে যুগে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কিন্তু এত ব্যাপকহারে রাজসেবার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার এর আগে দেখা যায়নি। প্রতিবাদহীন সমাজে তাই মন্ত্রীরা অমর হয়ে থাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও কার্যকরী করছেন, যা যে কোনও দেশের সাংস্কৃতিক জগতের দৈন্যতাকেই প্রকাশ করে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

একটি সংযোজন

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতৃদেব-এর স্মৃতিচারণায় স্বস্তিকা, ৮.১০.১৮ সংখ্যায় জানিয়েছেন, সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রচুর যশ ও অর্থের অধিকারী হয়েও মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে (১৯৪০ খ্রি:) সব ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চলে যান। জয়ন্তবাবুর সংক্ষিপ্ত বয়ান থেকে স্বাভাবিক ধারণা হবে যে, ভীষ্মদেব (১৯০৯- ১৯৭৭) বাকি জীবন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেই থেকে গিয়েছিলেন। বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৪৮ খ্রি: ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের আই.এ. পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

পার্টিশন মিউজিয়াম

এবার পুজোর সময় অমৃতসরে গিয়েছিলাম। ওখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলো হলো স্বর্ণ মন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ওয়াঘা বর্ডার, পার্টিশান মিউজিয়াম ইত্যাদি। কিন্তু এখানে আমি যে বিষয়টির উল্লেখ করতে চাই তা হলো স্বর্ণ মন্দির থেকে ১০ মিনিট হাঁটা পথে অমৃতসরের টাউনহল বিল্ডিংয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পার্টিশান মিউজিয়াম। পৃথিবীর বৃহত্তম মাইগ্রেশনের ইতিহাস। দেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে দেশভাগের যে রক্তাক্ত ইতিহাস, তাকে সংরক্ষিত করার সুন্দর প্রয়াস, যা মনকে ছুঁয়ে যায়। নানারকম ফোটো, দলিল দস্তাবেজ, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, মডেল ইত্যাদির মাধ্যমে অডিওভিসুয়াল উপায়ে তুলে ধরা হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম মাইগ্রেশনের ইতিহাস।

স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বজদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ইতিহাস— যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জানা উচিত।

স্বাভাবিক ভাবেই এই 'পার্টিশান মিউজিয়াম'-এ ভারতের পশ্চিমদিকে যে পার্টিশন হয়েছিল, তাকে ঘিরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা, তার ফলে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ অমুসলমান জনসাধারণের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে চলে আসার যে যন্ত্রণাদায়ক দুঃখময় ইতিহাস, সেইটি বেশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সে অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। কারণ তাঁদের কাছে সেই তথ্যগুলোই বেশি আছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এই বঙ্গপ্রদেশই সারা ভারতকে উজ্জীবিত করেছিল। এই বঙ্গের বিপ্লবীরাই সবচেয়ে বেশি প্রাণ বলিদান করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার আগে ও পরে এই বাঙ্গালার বুকেও হয়েছে ভয়াবহ হিন্দু নিধন। দেশভাগের ফলে এই বঙ্গপ্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি হিন্দু বাঙ্গালিকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান (এখনকার বাংলাদেশ) থেকে তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছে সর্বস্ব হারিয়ে। তাঁদের বেশিরভাগকেই বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, মাঠের ধারে, খালের ধারে অমানুষের মতো দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। সেই সব ইতিহাস ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। আমাদের আগামী প্রজন্ম জানতেও পারবে না স্বাধীনতার জন্য, দেশ ভাগের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের কত লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, কত রক্ত ঝরাতে হয়েছে, কী মূল্য চুকাতে হয়েছে। এই ইতিহাসকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে হলে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও অমৃতসরের মতো একটি 'পার্টিশান মিউজিয়াম' গড়ে তোলা অবশ্যই উচিত। এখনও সচেষ্ট হলে পার্টিশন সংক্রান্ত অনেক তথ্য, নমুনা, দলিল দস্তাবেজ, ফোটো, মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বয়ান ইত্যাদি জোগাড় হতে পারে। যত দেরি হবে পার্টিশানের ইতিহাসের উপাদান তত হারিয়ে যাবে। ইতিহাস- সংক্রান্ত কোনও গবেষক সংস্থা, সামাজিক কাজকর্ম করে এরকম সংস্থা সরকারের সহযোগিতায় এই কাজ করা যেতে পারে। পঞ্জাবের মানুষ যদি পারেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন পারবে না? বাঙ্গালিরা কি তাঁদের সংগ্রামের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন?

'স্বস্তিকা'র সঙ্গেও বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি যুক্ত আছেন। আমি 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকের মাধ্যমে তাঁদের কাছে আবেদন রাখছি— আপনারা এ ব্যাপারে পথ দেখান। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে একটি দাবিপত্র তৈরি করে 'স্বস্তিকা'র পক্ষ থেকে মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পেশ করা যেতে পারে। এই কাজটিকে সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর একটি দাবিতে পর্যবসিত করতে হবে।

—**প্রণব দত্ত মজুমদার,**
কলকাতা-৪৮।

বাম-কংগ্রেস এক হচ্ছে

সূর্যকান্তবাবু সেকুলারিজমের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে কংগ্রেসকে ভোট দিতে বললেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী ভাগাভাগি করার কথা বললেন বিজেপির বিরুদ্ধে। তিনি কিন্তু ওবিসিতে এ/বি ভাগ করেছেন।

এই সেকুলারিজমের ভক্তরা বেশ বোঝেন কখন কী বলতে হয়। অনেক বামপন্থী আছেন যারা পূর্ব -পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে চলে আসার পূর্বে টের পেয়েছেন যে যে তাঁরা পোয়ালের গাদায় বসে আছেন। তাই সেকু-মন্ত্র ছেড়ে হাওয়া বুঝে গ্রামের গরিব হিন্দুদের ছেড়ে আগে ভাগে ভারতে চলে এসে কলকাতার আশে পাশে বসবাস শুরু করলেন। আর সেকুলারিজমের রাজনীতি শুরু করলেন। এই বামপন্থীরা (বাংলাদেশি) এই রাজ্যে ৩৪ বছর ধরে ক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং সেকুলারিজমে বাতাস দিয়েছেন। তাঁরা এইটুকু বুঝেছেন— সেকুলার হতে গেলে ইঁটের পাঁজায় উপরে বসতে হয়--- পোয়ালের গাদায় নয়।

এক নেতা সম্প্রতি বলেছেন যে বিজেপির এখনও ঠিক মতো জমি তৈরি হয়নি। এঁরা জমি তৈরির আশায় থাকেন।

কিছু নেতা আছেন যারা স্রোতের অনুকূলে থাকতে ভালোবাসেন— হয়তো ভাবেন আমার একটি কন্যা অথবা পুত্র আছে— তারা থাকেন কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্র, গুজরাট অথবা ইংল্যান্ডে। তেমন বুঝলে বিমানের টিকিট কিনে নেব। আর সেখানে গিয়ে আবার সেকুলারের বাণী আওড়াবো। 'দেখ কেমন লাগে', 'আঁতেল' ইত্যাদি শব্দ এদের জন্যই অতি উৎকৃষ্ট।

—**অসিত কুমার দত্ত,**
বহিরগাছি, নদীয়া।

'একটু ফ্যান দাও মা'

এটা খুব আনন্দের বিষয় যে, আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বছর মহাধুমধাম সহকারে পালিত হয়েছে। কিন্তু ওই বছরই কুখ্যাত মুসলিম লিগ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ৫০ লক্ষ বাঙ্গালিকে অনাহারে প্রাণ দিতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ওই হতভাগ্য ৫০ লক্ষ বাঙ্গালির স্মরণে কোনও সভাসমিতি বা লেখালেখির মাধ্যমে তাদের স্মরণ করা হয়নি।

তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও করা হয়নি। মৃতের ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র এবং তথাকথিত নিম্নবর্গের বলে কি?

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০্ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

সর্দার প্যাটেল আধুনিক ভারতের সংহতি-পুরুষ

বিনয়ভূষণ দাশ

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান রূপকার। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতোই এক সফল আইনবিদ হিসেবে নাম এবং প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরে। তিনি ব্রিফলেস ব্যারিস্টার ছিলেন না, ছিলেন সফল আইনবিদ। ইংল্যান্ড থেকে বার-অ্যাট-ল হবার পরে প্রথমে গুজরাটের গোধরাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। শেষে আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হন। আইন ব্যবসায়ের উন্নতির শিখরে উঠে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে আইন ব্যবসা ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গুজরাটের 'খেড়া' সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু হয় তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

তখন, বিশেষ করে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা সাধারণ 'মঞ্চ' অথবা 'প্লাটফর্ম'। এই মঞ্চ বা দলে দুই ধরনের রাজনীতি ছিল; একটি হলো 'ভারতীয় ভাবধারা' বা ইংরাজিতে বললে ইন্ডিয়ান ভিউপয়েন্টের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি আর অন্যটি হলো বিদেশি ভাবধারার উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করা। কংগ্রেসে এ দুটি ভাবধারার রাজনীতি একই সঙ্গে, পাশাপাশি চলেছে। স্বাধীনতার আগে এবং ঠিক পরে এই দুটি ধারাকেই ভিত্তি করে কংগ্রেসি রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, চৈতরাম গিদওয়ানি, পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন প্রমুখ নেতৃবর্গ আর দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীতে ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর কিছু সাঙ্গোপাঙ্গরা। এঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী আবার হিন্দু- মুসলমান কাল্পনিক ঐক্যের তাড়নায় উগ্রপন্থী মুসলমান আন্দোলন, 'খিলাফতের' সঙ্গেও কংগ্রেসকে যুক্ত করেছিলেন। আর এই আগ্রহ তাঁকে 'অন্ধে' পরিণত করেছিল। জওহরলাল নেহরু ছিলেন ভীষণ ক্ষমতালোভী এবং দোদুল্যমান চরিত্রের নেতা। তিনি ছিলেন ধনীর আদরের দুলাল। ছোটো থেকে তাঁর ভারতবর্ষকে চেনা জানার সুযোগ হয়নি। তাঁকে শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল ইংল্যান্ডের হ্যারো স্কুলে; কিন্তু সেখানে এবং পরবর্তীকালে ট্রিনিটি কলেজে তিনি কোনও বিশেষ দাগ কাটতে পারেননি। কিন্তু তিনি, ড. রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'Caught up in the whirl of London life'। তিনি আরও বলেছেন, 'Jawaharlal's Cambridge career was as undistinguished as his time in Harrow. He admitted that he 'was superficial and did not go deep down into anything." (Nehru and Bose)। যাইহোক, এছাড়াও এক তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন কংগ্রেসে যিনি নিজেই একটি বিশেষ শ্রেণী। তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি নিজেকে মহান, অসাম্প্রদায়িক হিসেবে চিত্রিত করেছেন, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একমাত্র 'অখণ্ড ভারতের পূজারি' হিসেবে। তিনি তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে ভারতভাগের পুরো দোষটাই চাপিয়েছেন বল্লভভাই প্যাটেলের ঘাড়ে। অথচ, অন্য অখণ্ড ভারতের পূজারিরা যেমন গান্ধী, খান আব্দুল গফ্ফর খান যিনি সীমান্ত গান্ধী হিসেবে পরিচিত তাঁরা কিন্তু ক্ষমতার অংশীদার হননি, মৌলানা আজাদ কিন্তু ক্ষমতার অংশীদার হতে কোনও দ্বিধাবোধ করেননি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন দ্বিধাহীন ভাবে। ভারতের ইতিহাসে গান্ধী, নেহরু এবং মৌলানা আজাদ একই দ্বিচারিতায় আক্রান্ত। মৌলানা সর্বদা ভান করেছেন অসাম্প্রদায়িক ও অখণ্ড ভারতের পূজারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অথচ, তিনি ছিলেন দারুল-উলুম দেওবন্দের অনুগত নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি অখণ্ড ভারত চাইতেন, কারণ তাঁর ধারণায় অখণ্ড ভারতই মুসলমানদের সত্যিকারের নিরাপত্তা দিতে পারে এবং এই দেশকে ধীরে ধীরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে দেওবন্দের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে নেওয়া যাবে। তাঁর নিজের India Wins Freedom, Koenraad Elst-এর Negationism in India, রামমনোহর লোহিয়ার Guilty Men of India's Partition ইত্যাদি পুস্তক পড়লেই তাঁর এ মনোভাব স্পষ্ট হবে। তিনি বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন মুসলমান স্বার্থ নিয়ে।

সর্দার প্যাটেল ছিলেন ওই প্রথমোক্ত শ্রেণীর, ভারতীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ। তাঁর রাজনীতিও ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি গান্ধী শিষ্য হলেও গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসে শেষ হয়ে যায় ভারতীয় ভাবধারার রাজনীতি; আর এখন তো ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে কংগ্রেসে আমদানি হয়েছে আরবপন্থী রাজনীতি। স্বাধীন ভারতে তাঁর সংখ্যাগুরু ভোটে প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। তখন সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস একমাত্র তাঁরই নাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিল, জওহরলাল নেহরু একটি প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও সমর্থনও পাননি। ১৫টি রাজ্য/আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে ১২টি রাজ্য কমিটি সর্দার প্যাটেলের পক্ষে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছিল আর তিনটি রাজ্য কমিটি কারও পক্ষেই নাম প্রস্তাব করেনি। মহাত্মা গান্ধী নেহরুকে একথা বললে নেহরু উত্তরে বলেন, সেক্ষেত্রে তিনি ইস্তফা দেবেন এবং কংগ্রেসকে বিভক্ত করবেন, তাহলে স্বাধীনতাও পিছিয়ে যাবে। জওহরলালের এই ক্ষমতালোভ গান্ধীকেও বিস্মিত করে দেয়। যাইহোক, তিনি তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী সর্দার প্যাটেলকে চিরকালই বঞ্চিত করে জওহরলালকে বিনা কারণে পুরস্কৃত করেছেন, এবারও তাই করলেন। সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ ও কংগ্রেসের সংবিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে গান্ধী জে. বি. কৃপালানিকে দিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যকে দিয়ে জওহরলালের পক্ষে প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করলেন যেটা কংগ্রেস সংবিধান বিরোধী। গান্ধীজী জানতেন, জওহরলাল তাঁর কথা না শুনলেও সর্দার প্যাটেল তাঁর কথা মান্য করবেন। সুতরাং তিনি সর্দারকে

জওহরলালের পক্ষে তাঁর প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে বললেন। প্যাটেল অনুগত গান্ধী শিষ্য হিসেবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিলেন, মেনে নিলেন গান্ধীর অন্যায় আবদার। গান্ধীর অন্ধ জওহরলাল প্রীতি আবার দেশকে সঠিক নেতৃত্বদান থেকে বঞ্চিত করলো। গান্ধী জানতেন তাঁর এই অন্যায় কাজকে। তিনি তাঁর কাজের সাফাই দিয়েছিলেন এই বলে, 'He (Nehru) has made me captive of his love। দ্বিচারিতায় অভ্যস্ত গান্ধীজী ন্যায়নীতি বিরোধী, দেশহিতের বিরোধী সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে। ফলশ্রুতিতে জওহরলাল নেহরু হলেন স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হলেন প্রথম উপ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রী।

বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ও দক্ষ মন্ত্রী হিসেবে তিনি নানা বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। তিনি দেশের প্রশাসনিক সংস্কার, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশীয় রাজ্যসমূহের একীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

যদিও এই প্রবন্ধে তাঁর দেশীয় রাজ্যসমূহের একীকরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েই উপসংহার টানবো। ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে ভারতে দু' ধরনের রাজ্য ছিল। দেশের বেশির ভাগ অংশই ছিল সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন এবং বাকি অংশ ছিল বিভিন্ন বংশানুক্রমিক দেশীয় রাজা-মহারাজাদের শাসনাধীন; যদিও তাঁরা ব্রিটিশরক্ষিত কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের দরবারে একজন ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' থাকতো। এছাড়াও কিছু ঔপনিবেশিক ছিট মহল ছিল যেগুলি ফ্রান্স ও পর্তুগাল সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। তৎকালীন সরকার ওই দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ফরাসি ও পুর্তুগিজ ছিটমহল ভারতে সঙ্গে একীকরণের নীতি গ্রহণ করেছিল। এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এবং তাঁর সহকারী হিসেবে দক্ষ অফিসার ভি. পি. মেননকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের নাম ছিল 'স্টেটস ডিপার্টমেন্ট'। সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যসমূহের একীকরণের জরুরি গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত দেন। সর্বমোট ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য ছিল। তিনি লৌহমুষ্টি নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি সমস্ত দেশীয় শাসকদের কাছে পরিষ্কার ঘোষণা করে দিলেন, ভারতের মধ্যে কোনও দেশীয় রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়ে থাকাকে তিনি স্বীকার করেন না। সর্দার প্যাটেল দেশীয় শাসকদের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী সত্ত্বার কাছে আবেদন করেন জাতীয় স্বার্থে তাঁরা যেন ভারতের সঙ্গে যোগদান করে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে দেশ গঠনে যোগদান করেন। তিনি তাঁদের প্রতিরক্ষা, বিদেশ বিষয় এবং যোগাযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছেড়ে দিতে রাজি করান। তাছাড়াও তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজন্যদের ঐক্য ভেঙে দিতে সমর্থ হন। এই ভাবে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর মধ্যে হায়দরাবাদ, জুনাগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতে বিলীন হয়ে যায় তাঁর আন্তরিক চেষ্টায়। তিনি এই সমস্ত দেশীয় রাজ্য সম্মিলিত করে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন এবং সেটিকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেন।

এর পরে আসে জুনাগড়, হায়দরাবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর একীকরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদিও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ছিল তারা কোন দেশে যোগদান করবে তা স্থির করবার। তা সত্ত্বেও তাঁদের ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতা মানা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এরকমই একটি দেশীয় রাজ্য হলো গুজরাটের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জুনাগড় রাজ্য। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন মুসলমান নবাব কিন্তু প্রজাদের ৮০ শতাংশের বেশি ছিল হিন্দু। কিন্তু নবাব ঘোষণা করেন যে তিনি পাকিস্তানে যোগদান করবেন। নবারের এই সিদ্ধান্তে হিন্দু প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার জুনাগড় সীমান্তে সেনা পাঠায় এবং জুনাগড়ের সঙ্গে বাইরের সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। মঙ্গরোল এবং বাবরিয়াবাদ পুর্নদখল করে। এমতাবস্থায় নবাব ও তাঁর পরিবার পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। ৭ নভেম্বরের জুনাগড় কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার জুনাগড়ের দখল নেয় এবং ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত গণভোট শতকরা ৯৯ শতাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়।

এর পরে আসে হায়দরাবাদের পালা। এই দেশীয় রাজ্যের এক কোটি সত্তর লক্ষ প্রজার ৮৭ শতাংশ মানুষই হিন্দু, কিন্তু শাসক নিজাম ওসমান আলি খাঁন ছিলেন মুসলমান আর এর রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা। এই অভিজাত সম্প্রদায় ও শক্তিশালী নিজামপন্থী দল ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন চাইত হায়দরাবাদ স্বাধীন দেশ হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখুক। এমনকী ইত্তেহাদুল-মুসলিমিনের সভাপতি এবং রাজাকার মিলিশিয়া বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা কাশিম রিজভি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে হুমকি পর্যন্ত দেয় যে ভারত সরকার যদি গণভোটের উপর জোর দেয় তাহলে তরবারির সাহায্যেই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে নিজাম ১৯৪৭ সালের জুন মাসে এক 'ফরমান' জারি করে হায়দরাবাদকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

প্যাটেল লৌহমুষ্ঠিতে নিজামকে দমন করেন। যখন নিজাম রাজাকারদের দ্বারা ওই দেশীয় রাজ্যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে শুরু করেন তখন প্যাটেল পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং হায়দরাবাদে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর আদেশ করেন। বাঙ্গালি মেজর-জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ছিলেন ওই বাহিনীর নেতৃত্বে। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন নিজামের বাহিনী কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারলেও এর পরে তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করে। পরের দিন ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনা হায়দরাবাদ শহরে প্রবেশ করে এবং ওই রাজ্যের দখল নেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর কাশিম রিজভি গ্রেপ্তার হয়। ১৮ জেনারেল চৌধুরী মিলিটারি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজাম আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং হায়দরাবাদ ভারতের অঙ্গীভূত হয়। এই ভাবে কোনও গৃহযুদ্ধ ছাড়াই সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অঙ্গীভূত করেন এবং দেশের সংহতি স্থাপন করেন।

বাকি রয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এক্ষেত্রে নিজে হস্তক্ষেপ করেন; সর্দারকে মাথা ঘামাতে দেওয়া হয়নি এক্ষেত্রে। কাশ্মীর তাই আজও এক গুরুতর সমস্যায় আক্রান্ত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে অটো-ভন্-বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির একীকরণ সম্ভব হয়েছিল আর বিংশ শতাব্দীতে খণ্ড-বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন ভারতের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর তাই এই ভারতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সবার চেয়ে মাথা উঁচু করে। ■

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি-সংঘর্ষ ইতিহাস

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

মানুষের শরীর থেকে যেমন প্রাণ চলে গেলে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যায়, মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনি কোনও দেশের সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে গেলে সেই দেশের বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা শেষ হয়ে যায়। সংস্কৃতি হলো দেশের প্রাণ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ। ভারতীয় সংবিধানে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। ভগবান শ্রীরাম ভারতের আস্থার প্রতীক। সমাজ জীবনে ব্যক্তিচরিত্র, রাষ্ট্রচরিত্র এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় মর্যাদাপুরুষোত্তম। রামরাজ্য অর্থাৎ শীল ও লোককল্যাণকারী রাজ্য। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন— "যে দেশে রামচন্দ্রের মতো পুরুষ রয়েছেন, সেই দেশে হিন্দু, মুসলমান ও পারসিদের গর্ব করা উচিত। অযোধ্যায় যেখানে শ্রীরামের জন্ম হয়েছে, সেখানে একটি মন্দির হোক। যখনই আমি অযোধ্যা যাই তখনই সেখানেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। রামনাম ঈশ্বরের অনেক নামের মধ্যে এক।"

ভগবান শ্রীরামের জন্মভূমি সূর্যবংশীয় রাজার রাজধানী, মোক্ষদায়িনী সপ্তপুরীর মধ্যে একটি। জৈন, বৌদ্ধ, শিখ গুরুরা প্রাচীন ভারতে সরযুর তীরে এই অযোধ্যা নগরের গুণগান করেছেন। সারা দেশের ঐতিহাসিকরা, বিদেশি পর্যটকরা নিজ নিজ রচনায় অযোধ্যার বর্ণনা করেছেন। সাংস্কৃতিক ভারতের মানচিত্রে অযোধ্যা নগরের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং ১৫২৮ সালে অযোধ্যা পৌঁছায়। বাবরের সেনাপতি মির বাকি বাবরের আদেশে অযোধ্যা আক্রমণ করে। যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুর বীরগতি হওয়ার পর মির বাকি রামমন্দির কামান দিয়ে ধ্বংস করে। রামমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ওই স্থানে মসজিদের মতো একটি ধাঁচা খাড়া করে। সারা ভারতে হিন্দুদের আস্থার কেন্দ্র রামজন্মভূমিতে মন্দির ধ্বংসের কারণ রামভক্তদের অপমান ও বেদনার বিষয় হতে থাকে। ফলস্বরূপ, ১৫২৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকে— রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য। ৭৬ বার যুদ্ধ হয়। লক্ষাধিক রামভক্তের বলিদান হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর বালকরূপে (রামলালা) শ্রীরামের মূর্তি ওই ধাঁচার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানের প্রকট হওয়ার কথা ওই সময়ের সুরক্ষাকর্মীরাও স্বীকার করেন। হাজার হাজার রামভক্ত তখন থেকে পূজা ও সংকীর্তন আরম্ভ করে দেয়।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৯ তৎকালীন জেলাশাসক কে. কে. নায়ার

অবস্থা বুঝে ওই ক্ষেত্রকে বিতর্কিত ক্ষেত্র উল্লেখ করে রামলালাকে তালাবন্ধ করে দেন। কেবলমাত্র পূজা পাঠের জন্য এক জন পুরোহিত নিয়োগ করেন। সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ফৈজাবাদের মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান শ্রীরাম বর্মাকে রিসিভার হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

১৯৫০ সালে এক রামভক্ত ফৈজাবাদের জেলা কোর্টে আবেদন করেন রামলালা দর্শনের সব রকমের বাধা দূর করার জন্য। ওই একইরকম আবেদন আরও একজন রামভক্ত করেন। কোর্ট দু'জনের ক্ষেত্রে রামভক্তদের পক্ষে রায়দান করেন। পরে নির্মোহী আখড়া দ্বারা আবেদন করা হয়, জন্মভূমি মন্দিরে রিসিভার তুলে দিয়ে মন্দির ব্যাবস্থার দায়িত্ব মহন্ত জগন্নাথ দাসকে যেন দেওয়া হয়। অপরদিকে তখন কেন্দ্রীয় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড কোর্টে আবেদন করে ধাঁচার মধ্য থেকে মূর্তি সরিয়ে দিয়ে সার্বজনিক মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে ওই স্থানটিকে তুলে দেওয়া হোক।

১৯৮৩ সালে মজফ্‌ফরনগরে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কংগ্রেসের গুলজারিলাল নন্দা এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী দাউদয়াল খান্না উপস্থিত ছিলেন। শ্রীখান্না তাঁর ভাষণে বলেন, শ্রীরাম জন্মভূমি অযোধ্যা, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মথুরা এবং বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের উপর নির্মিত মসজিদ হিন্দু স্বাভিমানের প্রতি আঘাতস্বরূপ। হিন্দু সম্মেলনে ওই তিনটি মন্দির মুক্ত করার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়। গোরক্ষ পীঠাধীশ্বর মহন্ত অবৈদ্যনাথজীর নেতৃত্বে 'শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ সমিতি' গঠন করা হয়।

১৯৮৪ সালে শ্রীরাম জানকী রথ পরিক্রমা এবং ১৯৮৫ সালে কর্ণাটকের উড়ুপিতে সন্তদের উপস্থিতিতে ধর্মসংসদে দেশজুড়ে জন-জাগরণের মাধ্যমে 'তালাখোলো' আন্দোলন প্রারম্ভ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এবং মন্দির নির্মাণের জন্য 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে চন্দ্রকান্ত সোমপুরা একটি মন্দিরের মডেল তৈরি করেন। ২৭০ ফুট লম্বা, ১৩৫ ফুট চওড়া এবং ১২৫ ফুট উঁচু পাথরের একটি মন্দির।

১৯৮৯ সালে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে পুনরায় ধর্মসংসদের আয়োজন করা হয়। পূজ্য দেওরাহ বাবার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্রামে গ্রামে মন্দির নির্মাণের জন্য শিলাপূজনের ব্যবস্থা করা হবে। দেশ বিদেশের ২ লাখ ৭৫ হাজার জায়গা থেকে পূজিত শিলা অযোধ্যা পৌঁছায়। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ শিলাপূজনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বিহারের তথাকথিত অবহেলিত সমাজের এক রামভক্ত শ্রীকামেশ্বর চৌপালের হাত দিয়ে শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশ সরকার বিতর্কিত ধাঁচা ছাড়া তার চারপাশে ২.৭৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে। পরে তা সমতল করা হয়। উঁচু নীচু জমি সমতল করার সময় মাটির নীচে কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে একটি শিব পার্বতীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর করসেবার আয়োজন করা হয়। বিচারালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে করসেবকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। প্রশাসনের বাধা উপেক্ষা করে করসেবকরা বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংস করে দেয়। ধাঁচার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বাঁশ বল্লার অস্থায়ী ত্রিপলের মণ্ডপ তৈরি করে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাতারাতি পূজা অর্চনা আরম্ভ করে দেওয়া হয়। দুদিন পর কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে কার্ফু জারি করা হয়। তখন থেকে ভগবান তাঁবুর মধ্যে আজ পর্যন্ত বিরাজমান রয়েছেন।

২০০৭ প্রয়াগ কুম্ভে ধর্মসংসদে এবং ২০১০ হরিদ্বার মহাকুম্ভে সন্ত সম্মেলনে রামমন্দির নির্মাণের জন্য সংকল্প নেওয়া হয়। দেশ জুড়ে দেবীশক্তি জাগরণের জন্য 'হনুমতশক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান' কার্যক্রম নেওয়া হয়। ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ এক রায় দেন যে, অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থান এবং জন্মস্থানটিকেকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেন। এর বিরুদ্ধে আবার দু'পক্ষ সমাধানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

গত বছর উডুপী ধর্মসংসদের পর সন্তগণ মনে করেছিলেন কেন্দ্রে মোদী এবং রাজ্যে যোগীর সরকারের নেতৃত্বে মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হবে। অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপত দীপক মিশ্র ২ অক্টোবর তাঁর কার্যকাল সম্পূর্ণ করার আগে রামমন্দিরের পক্ষে ইতিবাচক রায় দেবেন— এমন ধারণা কার্যকর্তাদের মনে ছিল। কিন্তু ফল বিপরীত হবে পূর্বাভাস পেয়ে ৫ অক্টোবর সন্তরা দিল্লিতে মিলিত হয়ে কিছু কার্যসূচি ঘোষণা করেন। সন্তরা মনে করছেন কোর্টের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা এবং মুসলমানদের সঙ্গে বার্তালাপ মরিচীকার পেছনে দৌড়ানোর মতো। তাই সংবিধানে আইন সংশোধন করে সংসদের মাধ্যমে রামমন্দির নির্মাণের বাধা দূর করা এক মাত্র রাস্তা। জনজাগরণ, সাংসদের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজ্য অনুসারে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে যেন রামমন্দিরের জন্য অধ্যাদেশ আনা হয়।

প্রশ্ন হলো, ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তির কাছে ভগবান রামচন্দ্র যদি রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ হন তাহলে তাঁর জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণের জন্য কিসের বাধা। একে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে তৈরি করার বাস্তবতা কী? তথাকথিত বাবরি ধাঁচা নির্মাণ করার আগে সেখানে শ্রীরাম জন্মভূমিতে কোনও মন্দির ছিল কিনা? যদি মন্দির থেকে থাকে তাহলে তা পুনর্নির্মাণ কবে হবে? এর দায়িত্ব কার? সর্বোপরি, ভগবান রামলালা আর কতকাল তাঁবুর তলায় থাকবেন?

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক)

রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে বিজেপিকে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রামমন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় পাঁচ দশক ধরে রামমন্দির প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট কোনও সিদ্ধান্তই জানাতে পারেনি দেশবাসীকে। কোনও না কোনও অজুহাতে রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানি বারবারই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র তাঁর অবসর গ্রহণের অব্যবহতি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ২৯ অক্টোবর থেকে রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হবে। সেই মতো দেশবাসীর একটা বড় অংশের আশা ছিল— এতদিনের ঝুলে থাকা এই প্রসঙ্গটির এবার একটি নিষ্পত্তি হতে চলেছে। মামলার শুনানি হলে রামমন্দিরের পক্ষেই যে সুপ্রিম কোর্টের রায় যাবে— তা নিয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। কেননা, ইতিপূর্বেই পুরাতত্ত্ব বিভাগের খনন কার্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, রামজন্মভূমি স্থলে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরই ছিল। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়েছে। এও প্রমাণ হয়েছে, সেই হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেই পরবর্তীকালে মসজিদের ধাঁচা গড়ে উঠেছে। এই সব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ বিবেচনা করলে এই মামলার রায় যে রামমন্দিরের পক্ষেই যাওয়া উচিত— তা নিয়ে কারও মনেই কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়; নেইও। তদুপরি, রামমন্দিরের সঙ্গে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আবেগের প্রশ্নটিও জড়িত। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নির্দিষ্ট করে দেওয়া ২৯ অক্টোবর রামমন্দির মামলার শুনানির প্রথম দিনেই বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ সম্পূর্ণ অন্য সুরে কথা বললেন। ওই দিন তো মামলার শুনানি হলোই না, বরং মাত্র আড়াই মিনিটের ভিতর সুপ্রিম কোর্ট তার একটি অবাক করা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল। শুনানির কোনও দিনক্ষণ না জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলল— জানুয়ারি মাসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, রামমন্দির মামলার শুনানি কবে শুরু হবে। এর কারণ হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, তাদের মতে রামমন্দির মামলাটি অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। প্রায় পাঁচ দশক ধরে ঝুলে থাকা যে মামলাটির নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, সেই মামলাটিকেই আবার অনিশ্চয়তার বিশ বাঁও জলে ফেলে দিলেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্টের এহেন সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিতর্ক বেঁধেছে— উঠে এসেছে কিছু প্রশ্নও। রাজনৈতিক আবহাওয়াও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে যে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়েছে তা হলো— (১) কোন যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে যে, এতদিনের এই অমীমাংসিত মামলাটি অগ্রাধিকারের তালিকায় পড়ে না? (২) জাল্লিকাট্টু, শবরীমালা বা সমকামিতা প্রসঙ্গে যদি সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত রায় দিতে পারে— তাহলে এক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায়? (৩) সুপ্রিম কোর্টের এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তকে কার্যত অমান্য করা হয়েছে। নৈতিকতার দিক দিয়ে এটা কতটা সমর্থনযোগ্য? এবং (৪) এর আগে কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিব্বল সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যেন রামমন্দির মামলার শুনানি শুরু না হয়। শুনানি শুরু হলে এই মামলার রায় যে রামমন্দিরের পক্ষেই যাবে— সিব্বল এই আন্দাজ আগেই করেছেন। এবং মামলার রায় রামমন্দিরের পক্ষে গেলে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের যে ভরাডুবি হবে— তা বুঝতেও সিব্বলের দেরি হয়নি। ফলে সেই রকম একটি আশঙ্কা থেকেই কার্যত এরকম

একটি রাজনৈতিক আবেদন সিব্বল সুপ্রিম কোর্টে করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তাতে কর্ণপাত করেননি। সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত কিছুটা ঘুরিয়ে হলেও সিব্বলের রাজনৈতিক আবেদনকে সিলমোহর দিয়েছে। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পিছনে কেউ যদি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখে— তাহলে তা কি খুব অন্যায় হবে?

জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার শুনানির দিনক্ষণ কবে স্থির করবে— তা তাদের বিবেচ্য বিষয়। তবে, ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সন্তমণ্ডলী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রত্যেকেই বলেছে— হিন্দুদের আবেগ নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য আর অপেক্ষা না করে অবিলম্বে অধ্যাদেশ জারি করে রামমন্দিরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে তা রামজন্মভূমি ন্যাসের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এবং অবিলম্বে রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাক। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত দেখে এরা মনে করছে— রামমন্দির মামলার শুনানির দিনক্ষণ ক্রমশই সুপ্রিম কোর্ট পিছিয়ে দিতে থাকবে। সেই সঙ্গে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রামমন্দির নির্মাণের জন্য দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিটাও এরা মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপিকে। সঙ্ঘ পরিবার যখন রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে আর দেরি করতে রাজি নয়, কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে। এর ভিতর কংগ্রেসের আনন্দটা একটু বেশিই। রামমন্দির মামলাটি যেন ঝুলে থাকে— তার জন্য কংগ্রেস বরাবরই যে-কোনও মূল্যে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। এমনকী রামমন্দির মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল সুপ্রিম কোর্টে যে সওয়াল করেছিলেন, তা সমস্ত রকম শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে একটি রাজনৈতিক ভাষণের রূপ পেয়েছিল। কংগ্রেস এটুকু জানে, রামমন্দির ইস্যুটি সম্পূর্ণ ভাবেই বিজেপির ইস্যু। এই ইস্যুটি কংগ্রেস কোনওভাবেই বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আগেই বলেছি, কংগ্রেস এও আন্দাজ করেছে, এই মামলার শুনানি শুরু হলে, এর রায় রামমন্দিরের পক্ষেই যাবে। আর রায় রামমন্দিরের পক্ষে গেলে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-ঝড়ের মুখে কংগ্রেসকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই রাজনৈতিক কারণে, যে কোনও মূল্যেই কংগ্রেস এই রায়কে আটকাতে চেষ্টা করবে। তবে, কপিল সিব্বলের মতো কংগ্রেস নেতারা বা বিজেপি বিরোধী সেকুলার-বামেরা যতই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে উল্লসিত হোন না কেন— আখেরে যে তাদের লাভ কিছুই হবে না— সে বোধটি তাদের এখনো হয়নি। মুসলমান তোষণের রাজনীতি করতে মেকি ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে গিয়ে কংগ্রেস, সেকুলার এবং বামপন্থী দলগুলি সেই স্বাধীনতার পর থেকেই হিন্দু আবেগে আঘাত দিয়ে এসেছে। সেই আঘাতের মাত্রা ক্রমাগতই বেড়েছে। কমেনি। ক্রমাগত এই আঘাতের ফলে হিন্দু জনগোষ্ঠীও কিন্তু সংগঠিত হয়েছে। তার প্রমাণ এদেশের গরিষ্ঠাংশ রাজ্যে বিজেপির সরকার। কংগ্রেসও এখন বুঝছে— এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ক্রমশ তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনি তাঁর দলীয় রিপোর্টেও বলেছেন, কংগ্রেসকে অত্যধিক মুসলমান তোষণ এবং হিন্দু বিরোধিতার লাইন থেকে সরে আসতে হবে। ফলে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকেও এখন দায়ে পড়ে নিজেকে পৈতেধারী শৈব বলে ঘোষণা করতে হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনের মুখে যতই কংগ্রেস বা সেকুলার বিরোধী দলগুলি নরম হিন্দুত্বের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করুক না কেন— সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু তাদের প্রতি খুব একটা সদয় হবে না। কারণ, এতদিন তারা যে আচরণ করেছে, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বিশ্বাসই তাদের প্রতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রামমন্দির মামলার শুনানি আরও বিলম্বিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ক্ষোভ আরও বাড়বে এবং তারা আরও সংগঠিত হবে। সেই সংগঠিত শক্তি কখনই কংগ্রেস বা বিরোধী সেকুলারদের পক্ষে যাবে না। বরং, রামমন্দির মামলার শুনানি শুরু হলে, আপাতত কংগ্রেসের এতটা বিপদ হয়তো হতো না। কারণ, শুনানি শুরু হলেও তার নিষ্পত্তি হতে কিছুটা সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বিরোধীরা বলতেই পারত— আদালতের যা সিদ্ধান্ত তা আমরা মেনে নেব। তাতে কারোর আবেগেই কোনওরকম আঘাত করাও হতো না, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুও এতটা ক্ষুব্ধও হয়তো হয়ে উঠত না। তা না করে, কপিল সিব্বলের মতো নেতাদের উল্লাস কংগ্রেসের পক্ষে হয়তো হারাকিরি হলো।

রামমন্দির ইস্যুতে যে তাঁদের আদৌ কোনও লাভ নেই— তা বোধকরি মায়াবতী এবং অখিলেশপ্রসাদ যাদবের মতো হিন্দি বলয়ের নেতারা বুঝতে পারছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন— রামমন্দির নিয়ে কার্যত তাঁরা একটি ফাঁদের ভিতর পড়ে গিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তাঁদের বিপদ, আবার, বিরোধিতা না করলেও তাঁদের বিপদ। এই সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করেই মায়াবতী এবং অখিলেশ এই প্রসঙ্গে অন্তত মুখ বুজে রয়েছেন।

বাকি রইল বিজেপি। রামমন্দির ইস্যুটি একান্তই তাদের। মামলার রায় রামমন্দিরের পক্ষে গেলে যে সম্পূর্ণ লাভ তাদেরই— এ আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে বিজেপি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরা ভুল ভাবছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তও বিজেপিকে লাভবান করে তুলতে পারে যদি বিজেপি এই প্রচারে যায় যে, রামমন্দির নির্মাণ করতে তারা আন্তরিকভাবে আগ্রহী, কিন্তু বিরোধীরা মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় খুশি। এই প্রচারের ফলেই বিরোধীদের মন্দির-বিরোধী রাজনীতিটিকে আরও বেশি করে যদি উন্মোচিত করতে পারে বিজেপি— তাহলে রাজনৈতিক লাভটি অবশ্যই তারা পাবে। তদুপরি, বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, রামমন্দির নির্মাণের প্রশ্নে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু চারবছর বিজেপিকে সময় দিয়েছে। এরপরও রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে টালবাহানা শুরু হলে তারা বিজেপির প্রতিও ক্ষুব্ধ হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু চিরকালই এদেশে বঞ্চিত হবে এবং তাদের আবেগ নিয়ে সবাই ছেলেখেলা খেলে যাবে— এমনটা কিন্তু কখনই কাম্য নয়। কাজেই বিজেপির হাতে অস্ত্র এখন একটিই। অধ্যাদেশ জারি করে জমি অধিগ্রহণ করা এবং রামমন্দির নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা। তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে বিজেপি অচিরেই এই কাজটি শুরু করবে বলেই আশা করা যায়। ■

আদালত এবিসিডি খেলছে হিন্দুরা রামমন্দিরের জন্য আর অপেক্ষায় রাজি নয়

প্রীতীশ তালুকদার

ন্যায়ালয় ধর্মাধিকরণ ন্যায়ধর্ম অনুসারে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট, রাষ্ট্র দ্বারা অধিষ্ঠিত; সকলের সর্বদা মান্য। কিন্তু বিচারক বেঞ্চের একাধিক বিচারকের মধ্যে একই বিষয়ে মতনৈক্য দেখা দেয়। এক আদালত অপর আদালতের রায়ের উপর সন্দেহ করেছে, তিরস্কার করেছে। এক বিচারক, এক আদালতে যেটা ঠিক, অপর বিচারক, অপর আদালতে সেটাই ভুল এমনটা অহরহ দেখা যায়। সেটা শুধু পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি তা বলা যায় না। নানা ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও চেতনা সমন্বিত দেশে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব বিশ্বাস, ধারণা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ন্যায়াধীশের চেয়ারে যিনি বসেন তিনিও এমনই একজন ব্যক্তি। ভারতের বিচার ব্যবস্থাও দুর্নীতি মুক্ত নয়, তাও সময়ে সময়ে দেখা গেছে। তাই প্রশ্ন জাগাটা খুব স্বাভাবিক যে, ন্যায়ধীশের চেয়ারে বসার সময় ব্যক্তি এসব কিছুর প্রভাব মুক্ত থেকে নিজস্ব বিশ্বাস, দর্শন-সহ ব্যক্তিসত্তাকে বাইরে ফেলে আসতে পারেন কি? সম্প্রতি বেশ কিছু বিষয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায় আমাদের যেমন বিভ্রান্ত করছে, তেমন সন্দিহানও। ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সাত বছর সময় লেগে গেল মাত্র দু'মিনিটের শুনানি করতে এবং ফের ঝুলিয়ে দিতে। সেই সঙ্গে মহামান্য বিচারপতির মন্তব্য গোটা হিন্দু সমাজের জন্য যথেষ্ট অসম্মানকরও। আদালতের আদৌ কোনও সদিচ্ছা আছে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বিতর্কিত রামমন্দির-বাবরি মসজিদ মামলার কথাই বলছি।

জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনায়েড— তাই মাও তাত্ত্বিক ভারভারা রাওদের স্বার্থে গ্রেপ্তারির সঙ্গে সঙ্গে রাত দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট বসতে পারে ও ততোধিক তৎপরতায় আদেশ জারি হতে পারে। ভারতীয় সেনার উপর পাথর হামলাকারীদের সুরক্ষা দিতে তৎপর হতে আদালতের সময়ের প্রয়োজন হয় না। আবার যেখানে হিন্দু ধর্মীয় অধিকারে আঘাত করার সুযোগ আছে সে পুরীর জগন্নাথ মন্দির হোক বা কেরলের শবরীমালা মন্দির, সকল ধর্মের মানুষের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে ভক্তদের ধর্মক্ষেত্রকে বিধর্মীর বিনোদন ক্ষেত্র বানানোর হুকুম দিতে আদালতের সময়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রামমন্দির যেহেতু হিন্দুর দাবি ও মর্যাদার বিষয়, তাই আদালতের সময় নেই। আপ্তবাক্যটা কি হিন্দু ধর্মীয় সম্মান, ভাবাবেগ ও হিন্দুদের ন্যায়ের অধিকারের জন্য নয়! শ্রীরামচন্দ্র ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও মর্যাদার প্রতীক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পুরুষ, হিন্দুর পরম আরাধ্য ভগবান। সেই ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি উদ্ধারে আর কত আবেদন-নিবেদন করতে হবে, কত কাল অপেক্ষা করতে হবে?

বাবরের হুকুমে নির্মিত হয়েছিল তাই বাবরি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে বা স্বাধীন ভারতে রামজন্মভূমি আন্দোলনের (১৯৪৯) পূর্বে বাবরি মসজিদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এখন যেটা বাবরি মসজিদ বলে চিৎকার করা হচ্ছে সেটা 'মসজিদ-ই-জন্মস্থান' নামে উল্লিখিত ইসলামিক গ্রন্থগুলোতেই। কার জন্মস্থান? বাবরের জন্ম আফগানিস্তানে, অযোধ্যায় নয়। অযোধ্যার ওই স্থান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান রূপেই প্রসিদ্ধ সেই রামায়ণের কাল থেকে। রামের সেই অযোধ্যায় মা সীতার রান্নাঘরটাও চিহ্নিত হয়ে সীতারসুই মন্দির হয়ে আছে। আর রামের জন্মস্থলে তার মন্দির থাকবে না তা হতে পারে না। সেটাই ছিল এবং সেটা বাবরের অন্যতম সেনাপতি মির বাঁকি ধ্বংস করে তারই ইট-পাথর দিয়ে সেই কাঠামোতেই গম্বুজের আকারে ধাঁচা তুলেছিল। তাই সে ধাঁচা তার আসল পরিচয় হারাতে পারেনি। 'মসজিদ-ই-জন্মস্থান' নামেই চিহ্নিত হয়েছে। হিন্দুরা তা কোনও দিনই মেনে নেয়নি, তাই তখন থেকেই বার বার হিন্দুরা তাদের পরম আরাধ্য ভগবান রামের জন্মভূমি উদ্ধারে ঝাঁপিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। চলছে আজও।

মন্দির উদ্ধারে লড়াই ও আবেদন-নিবেদনের বিধিবদ্ধ ইতিহাসটাও কম দিনের নয়। এখন থেকে একশো পঁয়ষট্টি বছর আগে ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে অযোধ্যার হিন্দু ও সাধু-সন্তরা তথাকথিত মসজিদ-ই-জন্মস্থান আসলে শ্রীরাম জন্মভূমি বলে দাবি করে। এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে বিপরীত দিক থেকে বাধা আসে ও কয়েক প্রস্থ হাঙ্গামা ও বেশ কিছু মৃত্যু ঘটে। এর প্রেক্ষিতে ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বিতর্কিত এলাকা ঘোষণা করে তার দিয়ে ঘিরে দেয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই আলাদা আলাদা পূজা ও প্রার্থনার অনুমতি দেয়। ১৮৮৫

রামমন্দির নির্মাণে সাধু-সন্তদের ধর্মাদেশ

- অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবছর ডিসেম্বরে শুরু হবে।
- এবছর ৬ ডিসেম্বর রামমন্দিরের শিলান্যাস হবে।
- আদালতের সিদ্ধান্ত দেরি হচ্ছে। সংসদে বিল আনতে হবে।
- অযোধ্যাতেই হবে ভব্য রামমন্দির।

সালে মহন্ত রঘুবর দাস প্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে রাম জন্মভূমি হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার দাবি করে ফৈজাবাদ আদালতে মামলা পেশ করেন। ১৯৩৪ সালে হিন্দুরা মরিয়া হয়ে উঠে তথাকথিত মসজিদের কাঠামোয় অঘাত করলে কিছু অংশ ভেঙে পড়ে ও ভিতর থেকে মন্দিরের অবশিষ্ট বেরিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার দু-বছরের মধ্যে ১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর হিন্দুরা বিতর্কিত কাঠামোর মূল গর্ভ গৃহে রামলালার মূর্তি দেখতে পায়। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ফের মহন্ত পরমহংস দাস নিত্যপূজার দাবিতে আপিল করেন। ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর নির্মোহী আখড়া বিতর্কিত স্থানের জমির অধিকার চেয়ে মামলা করেন। এর পর ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম মুসলমানরা রাজনৈতিক উস্কানিতে বাবরি মসজিদ দাবি করে মামলা করে।১৯৮৪ সালের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যুক্ত হলে আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। ১৯৮৯ সালে একটা আশাপ্রদ ফল আসে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট হিন্দুদের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে বিতর্কিত কাঠামোর তালা খুলে দিয়ে হিন্দুদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেয় ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তা পালন করেন। অপর দিকে মুসলমানরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যার ফলে কংগ্রেস ও রাজীব গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা করে পিছু হটে। তখন থেকে পিছনে ঠেলার প্রক্রিয়া চলছে।

মাঝে ঘটে গেছে বড় বড় আন্দোলন আর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ২০০৩ সালে লখনৌ হাইকোর্ট ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। ১২ মার্চ ২০০৩ থেকে ৭ আগস্ট ২০০৩ এই পাঁচ মাস খননকার্য ও অনুসন্ধানের পর সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী ও নকশা, হিন্দু শৈলীর কারুকার্য ও মূর্তি খোদিত মন্দিরের পিলার ও ভিতের ছবি সহ ৫৭৪ পাতার রিপোর্ট আদালতে পেশ করে। যাতে প্রমাণ হয় ওখানে উত্তর ভারতীয় শৈলীর প্রাচীন মন্দির ছিল এবং তা ভেঙেই ভিতের উপর মসজিদের কাঠামো নির্মাণ করে। অবশেষে ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাই কোর্টের তিন জাজের বেঞ্চ রায়ে জানায় যে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার খননে পাওয়া প্রমাণ ও অন্যান্য তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ওই মসজিদের কাঠামো এক উত্তর ভারতীয় প্রাচীন মন্দিরের উপর নির্মিত। তারা ওই বিতর্কিত কাঠামো সহ ২.৭৭ একর জমিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে কাঠামো অংশ সহ ২/৩ ভাগ ভূমি হিন্দুদের অর্পণ করতে আদেশ দেন এবং মুসলমান দাবিকেও কিছুটা মান্যতা দিয়ে অবশিষ্ট ১/৩ ভাগ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে প্রদান করতে বলেন। উভয় পক্ষের আবেদনে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। মে ২০১১-র শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায় রদ করে মামলা শুরু করে।

সরজু নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজধানী তা রামায়ণ সহ অজস্র প্রাচীন ইতিহাসে স্বীকৃত। বর্তমান অযোধ্যা নগরীর পরিবেশও রামস্মৃতির ঐতিহ্য নিয়ে রামময়। মন্দিরময় ভারতে বিদেশি বিধর্মী মোগল, পাঠান, তুর্কি হানাদার, দখলদার, খুনি। তাদের কাছে মূর্তি, মন্দির, পূজার বেদি হারাম অপবিত্র। তাই শাসন, শোষণ, লুট, গণহত্যার সঙ্গে অবাধে চলেছে মন্দির ধ্বংস। এখনও ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রমাণ, মুসলমান তাবেদার লেখকদের রচনাতেও। সোমনাথ মন্দির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে যার পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানের পর সেই তথ্য ও অন্যান্য প্রমাণাদি বিচার করার পর এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায়েই স্পষ্ট ছিল যে, রাম জন্মভূমি মন্দিরের পক্ষে হিন্দুদের দাবি বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের মুসলমানেরা রামজন্মভূমি মন্দির মেনে নিয়ে প্রাচীন কলঙ্ক মুছে সৌহার্দ্যের পরিবেশ বানাতে পারত। মসজিদের জন্য অন্যত্র জমি দেবার প্রস্তাব মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালতের বাইরে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘকাল তালাবন্ধ থাকার পর ১৯৮৯ সাল থেকে বিতর্কিত কাঠামোর ভিতর নিয়মিত শ্রীরামলালার পূজার্চনা হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, প্রত্নতাত্ত্বিক সকল অনুসন্ধান সম্পন্ন হওয়ায় এখন আর নতুন করে কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজনও নেই। তাই আশা ছিল মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত এর সমাধান করে একশো কোটি রামভক্ত হিন্দুর প্রতিক্ষার অবসান ঘটাবেন। অদ্ভুত ভাবেই দেখা গেছে অপর পক্ষ এবং কংগ্রেস ও তার অনুগামী কিছু রাজনৈতিক দল সমাধানের পরিবর্তে ঝুলিয়ে রাখতে জট পাকিয়ে চলেছে। তা হোক, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তো রাজনৈতিক দল নয় আর বিশেষ কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ও নয়, সেখানেও সেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১৮৮৫ সালে রঘুবর দাসের আপিল থেকে আজ ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৩৩ বছর, স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহন্ত পরমহংস দাসের আপিল থেকে আজ ৬৮ বছর ধরে হিন্দুরা আবেদন-নিবেদন করে চলেছে। সব শেষেও কবে কোন বেঞ্চে শুনানি শুরু হবে তার দিন ঘোষণা করতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের লাগল সাত বছর। শুনেছি অফিস চালানোর এ বি সি ডি আছে; এ= অ্যাভোয়েড, বি= বাইপাস, সি= কমপ্লেক্সসিটি, ডি= ডিনাই। আদালত সম্ভবত রামমন্দির বিষয়ে সেটাই অনুসরণ করছে। স্থির ছিল রোজ শুনানি করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। অথচ এর পরেও সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, আদালতের আরও অনেক মামলা আছে আর সেখানে এই মামলা প্রাথমিকতার তালিকায় পড়ে না। যার অর্থ, আশু সমাধানের কোনও ইচ্ছাই আদালতের নেই, যা যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক ও অবমাননাকর। অজুহাত, দীর্ঘসূত্রতা আর উষ্মা কিন্তু সেখানেই আঘাত করছে। তা যদি হয় তবে শ্রীরাম মন্দির নিয়ে বৃহত্তম হিন্দু সমাজের ন্যায় পাবার অধিকার ও ভাবাবেগের কি কোনও মূল্য নেই? আদালতের জন্য সমাজ নয়, সমাজের জন্য আদালত আইন সব কিছু। নিজ দেশে বিদেশি তস্কর আক্রান্ত কলঙ্কিত নিজ অবতার পুরুষের জন্মভূমি মন্দির উদ্ধারের জন্য, নিজ গৌরব ফিরে পেতে আইনের আশ্রয় নেবার পরও অনন্ত প্রতীক্ষা সম্ভব নয় কোনও জাতির পক্ষে। এরই ফলস্বরূপ বিতর্কিত কাঠামোর ধ্বংস ঘটেছে, অনেক মৃত্যুও হয়েছে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও তার জন্মভূমি ভারতবর্ষের ও হিন্দুদের বিশ্বাস, ভক্তি, মর্যাদা ও ভাবাবেগের স্থল। বিদেশি বিধর্মীর আঘাতের কলঙ্ক আমরা আর বইতে রাজি নই। সর্বোচ্চ আদালত উপেক্ষা করলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার দায় এড়াতে পারে না। এখন সেখানে শ্রীরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, বাকি শুধু প্রস্তাবিত ভব্য মন্দির নির্মাণ। বিজেপি রামমন্দির নির্মাণে সমস্ত বাধা দূর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপির সরকার; তারা সত্বর রামমন্দিরের পথ এখনই প্রশস্ত করুন। ন্যায্য অধিকার ও ভাবাবেগের স্রোতকে চার দিকে রুদ্ধ করে রোখা যায় না। নদীর মতোই সে বাধা ধ্বংস করে নিজের পথ করে নেয়। ■

রামমন্দির মামলার শুনানির জন্য সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে

অমৃতলাল ধর

রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ বিতর্ক শুরু হয়েছিল ১৮২২ সাল থেকে। ফৈজাবাদ ন্যায়ালয়ের কর্মচারী হাফিজুল্লাই এই বিবাদ উত্থাপন করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে নির্মোহী আখড়া প্রথম দাবি করে যে, অযোধ্যার বিতর্কিত মসজিদের জমিটি হচ্ছে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জন্মস্থান এবং সেই দাবি নিয়ে একটি মামলা করা হয়। ১৯৪৯ সালে ফৈজাবাদ দেওয়ানি আদালত একটি রায়ে বলে যে হিন্দু, মুসলমান ও নির্মোহী আখড়া তিনই ওই জমির ১/৩ অংশের মালিক। আনুমানিক ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর একটি রায়ে বলে যে, ওই ২.৭৭ একর জমিকে তিনটে সমান ভাগে ভাগ করে একটি ভাগ যেখানে রামলালা অবস্থান করছে সেখানে রামমন্দির নির্মাণ করতে হবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে দিয়ে। আর একটি অংশ পাবে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড, আর একটি অংশ পাবে নির্মোহী আখড়া। ২০১০ সালে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সুন্নি ওয়াকর্ফ বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। ২০১১ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় এবং রামজন্মভূমির জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আদেশ দেয়।

২০১৬ সালে সুব্রহ্মন্যম স্বামী ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে পক্ষভুক্ত হন ও রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে সওয়াল জবাব করার জন্যে অনুমতি প্রাপ্ত হন। ২০১৭ সালের ২১ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জে এস মেয়র মামলার পক্ষভুক্ত ব্যক্তি/ সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোর্টের রায়ে আপোশে বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে নেবার জন্যে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে বলে যে, মির বাকি যিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন

তাই ওই জমিতে তাদেরও অধিকার আছে। যদিও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ওই দাবিকে নস্যাৎ করে।

২০১৭ সালে উক্ত মামলার শুনানি চলাকালীন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি অশোক ভূষণ ও আর একজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত বেঞ্চ একটি রায় দেয় যাতে বলা হয়— **Offering prayer in a mosque did not constitute on intergral part of Islam**। এরপর সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের কাউন্সিল কপিল সিব্বাল দাবি করেন যে, এই মামলার পুনরায় শুনানি ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পরে স্থির হোক। কিন্তু তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র সেই দাবিকে খারিজ করে ২৯ অক্টোবর ২০১৮-তে নির্ধারণ করেন এই মামলার পুনরায় শুনানির জন্যে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইতিমধ্যে দীপক মিশ্র অবসর নেন। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ পূর্বের নির্ধারিত দিন ২৯ অক্টোবর ২০১৮-য় শুনানি না করে বলেন, যে বেঞ্চ এই মামলা শুনাবে সেই বেঞ্চই ঠিক করবে কবে শুনাবে। সেটা জানুয়ারিও হতে পারে বা তার পরে। কারণ এই মামলার নিষ্পত্তির জন্যে তিনি কোনও জরুরি কারণ খুঁজে পাননি। যদিও এই মামলা নিষ্পত্তির দিকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে নয়, সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। বিশেষত ভারতীয় হিন্দুদের হৃদ্‌স্পন্দন লুকিয়ে আছে এই মামলা নিষ্পত্তির ওপরে। অথচ আমরা দেখলাম যে শবরীমালা মামলা, জালিকাট্টু ও অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ মামলা ও বয়সে নবীন ধর্মীয় বিষয়-সহ বহু মামলাই সুপ্রিম কোর্ট নিষ্পত্তি করেছে এবং কিছু রায় হয়েছে মন্দিরে বহু প্রাচীন রীতিনীতির বিপক্ষে। কিন্তু বহু বিতর্কিত রামজন্মভূমি মামলা নিষ্পত্তি হলো না। এই রামের দেশেই 'রাম' অবহেলিত, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দেশে গীতা অবহেলিত। কারণ অধিকাংশ হিন্দু ক্ষাত্রধর্ম থেকে পিছিয়ে এসেছে। এছাড়া হিন্দুরা রাজনৈতিক নেতারা বেশিরভাগই জাতধর্ম ভুলে তোষণের রাজনীতিতে পারদর্শী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কি অর্ডিন্যান্স আনবে অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির জন্যে? সরকারের পূর্ণ অধিকার আছে রামমন্দির জন্যে অর্ডিন্যান্স আনার। যদিও সেই অর্ডিন্যান্স চ্যালেঞ্জ হতে পারে সংসদে ও আদালতে। সাংসদের ওপর নির্ভর করবে এই অর্ডিন্যান্সের ভবিষ্যৎ, কিন্তু এই অর্ডিন্যান্সকে যদি জুডিসিয়াল রিভিউয়ের ওপর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে সেই আবেদনের শুনানিও একইসঙ্গে হবে।

পরিশেষে একটা কথাই বলি। সরকারের তরফ যে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, না হলে ধীরে ধীরে বেশিরভাগ হিন্দুর মনে হীনম্মন্যতা বাসা বাঁধবে তা সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। ■

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর কলা সাধক সম্মেলন

গত ২৭-২৮ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ শহরের সারদা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কলা সাধক সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে

১৫০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন একটি সুদৃশ্য শোভাযাত্রা রায়গঞ্জের শহরে পথ পরিক্রমা করে। বিকালে সারদা বিদ্যামন্দিরের সেমিনার হলে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হয়। দীপ প্রজ্বলন করেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমীর চাঁদ। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীর সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নিরঞ্জন পণ্ডা, পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রমুখ নীলকণ্ঠ রায়, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ তালুকদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে তিনজন গুণী ব্যক্তি--- সংগীতগুরু সুকুমার ঘোষ, সুনীল কুণ্ডু এবং শ্রীমতী প্রতীমা দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দূরদর্শন শিল্পী শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর গান, কলিগ্রামের গীতি আলেখ্য, হরিশ্চন্দ্র পুরের মহিষাসুরমর্দিনী, শিলিগুড়ির দশ অবতার, কোচবিহারের ভাওইয়া গান ও নৃত্য, রায়গঞ্জের নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। শেষ দিনে সাংগঠনিক বৈঠক হয়। তাতে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব দেব।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম শিবপুর শাখার বনযাত্রা

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের হাওড়া শহরের শিবপুর শাখা গত ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর ওড়িশার গঞ্জাম, গজপতি ও কন্ধমাল জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়-বনে বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বনযাত্রার আয়োজন করে। হাওড়া মহানগরের ২০ জন পুরুষও ১৫ জন মহিলা বনযাত্রায় অংশ নেন। প্রথম ব্রহ্মপুর এলাকার পোড়ামাল গ্রামে 'গ্রামবিকাশ যোজনা'-র নমুনা দেখা হয়। এখানে ২০০টি গ্রামে বনবাসী সমাজের জীবনযাত্রা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চলছে। স্থানীয় বনবাসী যুবকরাই কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এরপর গজপতি জেলার গাইবালি গ্রামে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্রে শহরবাসী ও বনবাসীদের মিলনে অপূর্ব সমরসতার পরিবেশ নির্মাণ হয়। এখানে কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক রাজেন্দ্রভাই মাদলা সকলের সামনে বনযাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে পদ্মপুর মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বর্ণমণি স্বাস্থ্য সচেতনতা কেন্দ্র, কন্ধমালের কল্যাণ আশ্রম, মুণ্ডাকঙ্গা গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী দর্শন। এরই মধ্যে কোথাও কোনও বনযাত্রী তুলসীচারা রোপণ করেন। কোথাও বনবাসীদের পরম্পরাগত নৃত্যগীতে অংশগ্রহণও করেন বনযাত্রীরা। বনযাত্রার উদ্দেশ্য যে বনবাসী ও শহরবাসী একই সমাজের অভেদ্য অঙ্গ— তা অনুভব করলেন সবাই।

নরেশ ভবনে প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের বিজয়া সম্মেলন

গত ৩ নভেম্বর প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের বিজয়া সম্মেলন যথারীতি উল্লাস-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের মানিকতলার নরেশ ভবনে। জীবনের সর্ব কার্যক্ষেত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিকরা বিজয়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উৎসাহদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন বিএমএসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শংকর দাস, বর্তমান সম্পাদক সঞ্জয় শাহ্, পাট শিল্পের প্রবীণ নেতা শিব প্রসাদ সিংহ, হাওড়া জেলা সম্পাদক নিলয় দে, সঙ্ঘের সদস্য প্রাক্তন নেতা লালবাবু শাহ্, লেদার টেকনোলজিস্ট তারক সাহা প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। বিজয়া সম্পর্কে এক ভাবগম্ভীর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক অশোক কুমার দাস। সভার শেষে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দে।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে সায়েন্স সেমিনার

গত ৬ ও ৭ অক্টোবর তারকেশ্বর সংকুলের অন্তর্গত দ্বারহাট্টা ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সায়েন্স সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ব্যাপী এই দুদিনে মোট ২১টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ৫১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের মোট বারোজন বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা অডিও-ভিসুয়ালের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাস নেন।

প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা সরস্বতী শিশুমন্দির সমূহের সভাপতি আশুতোষ দে। দ্বিতীয় দিন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল গুরুদয়াল ইন্সটিটিউশনের সহ-শিক্ষক ড. রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেমিনারে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৪ নভেম্বর জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে 'এই শরতে এই হেমন্তে' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক মিলনসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার পাইকপাড়ার অনাথনাথ দেব লেনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ স্বামী ধর্মরূপানন্দ মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিশির ভট্টাচার্য, মধুসূদন শেঠ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'আমাদের কথা'র বিশেষ পুজো সংখ্যা উন্মোচন করেন স্বামীজী। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক কিংশুক সেনগুপ্ত। কবিতা, গান, নাচ পরিবেশিত হয়। মাধ্যমে বাংলার। কথা ও ছন্দ প্রযোজিত শ্রুতি নাটক 'রাতের অতিথি' অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শুভেন্দু ভট্টাচার্য।

এবিভিপি-র উদ্যোগে এন আর সি কর্মশালা

গত ২৮ অক্টোবর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের 'বিদ্যার্থী বিকাশ'-এর পরিচালনায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউটের সভাকক্ষে নাগরিক পঞ্জিকরণ বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কলকাতার ৮০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরেন্দ্র প্রসাদ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রবিরঞ্জন সেন, ড. জিষ্ণু বসু, গৌরব বসু প্রমুখ। কর্মশালার লক্ষ্য ছিল জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং তার প্রয়োজনীয়তা। সেই সঙ্গে 'সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০১৬' বিলের বিষয়ও আলোচিত হয়। হরেন্দ্রজী পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে কীভাবে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জিষ্ণুবাবু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের প্রয়োজনীয়তা, রবিরঞ্জন সেন শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য এবং রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও গৌরব বসু জনসচেতনতার বিষয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অপাংশু শেখর শীল।

সেবিকা সমিতির মালদহ শাখার বিজয়া সম্মেলন

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদহ শাখার বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১ নভেম্বর স্থানীয় টাউন হল সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন মালদহ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অবসর প্রাপ্তা শিক্ষিকা শ্রীমতী সন্ধ্যা কর্মকার। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষিকা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার। প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন সমিতি সম্ভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী মানসী কর্মকার। সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩৫০ জন মা-বোন উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৫ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ কার্যবাহিকা শ্রীমতী গরিমা বেঙ্গানী, জেলা কার্যবাহিকা শ্রীমতী স্মৃতিদাস সরকার প্রমুখ।

শিবিরাধিকারিণী হিসেবে ছিলেন শ্রীমতী মীরা চন্দ। শিবিরে ৫টি গ্রাম থেকে সেবিকারা অংশগ্রহণ করেন।

বৈভবশ্রী-র অখিল ভারতীয় বৈঠক

স্বয়ম্ভরতা গোষ্ঠী বৈভবশ্রী-র অখিল ভারতীয় টোলির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে গত ২৩ ও ২৪ অক্টোবর। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২২ জন সদস্য-সহ মোট ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য গুরুশরণ প্রসাদ, বৈভবশ্রীর সমন্বয়ক সুন্দর লক্ষ্মণ, সংযোজিকা শ্রীমতী

চন্দ্রিকাতাই চৌহান, সহ সংযোজক এন পি দেও, প্রশিক্ষক শ্রীশ পট্টবর্ধন। বৈঠকে পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কার্যকর্তারা তাঁদের কাজের ধরন এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 'বৈভবশ্রী' বাংলা পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন দত্তাত্রেয় হোসবালে।

মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক কেন্দ্রের আলোচনা সভা

গত ৪ নভেম্বর কলকাতার মাহেশ্বরী সভার অন্তর্গত মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে দ্বিতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষণ কেন্দ্রের সভাপতি দেবকিশান মোহতা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহেশ্বরী সংগীতালয়ের উপ সভাপতি গিরিরাজ লোহিয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সামাজিক কার্যকর্তার সমর্পণ ভাবই সমাজকে সংগঠিত করে থাকে। তিনি ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন মাহেশ্বরী ব্যাখ্যানমালার সম্পাদক অশোক ডাগা, মাহেশ্বরী সংগীতালয়ের সম্পাদক মহেশ দম্মানী, মাহেশ্বরী ক্লাবের সম্পাদক নরেন্দ্র কারনানী প্রমুখ। আলোচনা সভায় কেন্দ্রের মুখপত্র ই-পত্রিকা 'সক্ষম' প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন কেন্দ্রের সদস্য পঞ্চানন ভট্ট। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্পাদক অরুণ কুমার সোনী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ দাস ডাগা।

বিশ্বমাতা দেবী জগদ্ধাত্রী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নিহত হলো মহিষাসুর। ফিরে এলো শান্তি। স্বর্গের সিংহাসনে আবার বসলেন দেবরাজ। আর তখনই অকৃতজ্ঞতার ঘন অন্ধকারে আবছা হলো তাঁদের দৃষ্টি। তীব্র হয়ে উঠল অহমিকা বোধ। সেই অহং ভুলিয়ে দিল সত্যকে। দেবরাজ ভাবতে থাকেন, দেবী মহামায়া নন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বধ করেছেন মহিষাসুরকে।

দেবতাদের অহংবোধ তাঁদের বোঝায়, তাঁদেরই তেজসম্ভূতা ওই দেবী। তাঁরাই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের অস্ত্র। আর তারই শক্তিতে দেবী বধ করেছেন দুষ্ট অসুরকে। তাহলে তাঁরাই তো প্রকৃতপক্ষে হত্যা করলেন অসুরকে। এর জন্য দেবীর কোনও কৃতিত্বই নেই।

দেবতাদের এই অকৃতজ্ঞতা, এই অস্মিতা দেখে হাসলেন পরমা প্রকৃতি মহামায়া। পরব্রহ্ম তখন রূপ নিলেন এক যক্ষের। দেবতাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই রূপান্তর। রূপান্তরিত যক্ষ দেখা দিলেন দেবতাদের সামনে।

যক্ষের রূপ দেখে দেবতারা বিস্মিত। কিছুটা ভীতও। সন্ত্রস্ত দেবতারা যক্ষের পরিচয় জানার জন্য তাঁর কাছে পাঠালেন বায়ু দেবতাকে। বায়ুকে দেখে যক্ষ বলেন, কে তুমি? কেমন তোমার শক্তি।

বায়ু বলেন, আমি পবনদেব। মুহূর্তে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তছনছ করতে পারি আমি। আমার চকিত গতিতে এক লহমায় উৎপাটিত হয় সব মহাবৃক্ষ। আমার বেগের সামনে সবই তুচ্ছ।

যক্ষ বলেন, তাই! তা পরীক্ষা দাও। দেখাও তোমার শক্তির দাপট।

কী পরীক্ষা? কী করতে হবে আমাকে?

উত্তর না দিয়ে সামনে এক গাছি দুর্বা রাখলেন যক্ষ। তারপর বলেন, এই তৃণগাছিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওতো! দেখি কেমন শক্তিধর তুমি?

এই! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন বায়ু। আলতো ভাবে বয়ে যায় বায়ু। তাতে উড়ে যাওয়া দূরে থাক, সেই দুর্বার বুকে একটুকু কাঁপনও জাগে না। বিস্মিত বায়ু এবার বেগ বাড়ায়। তীব্র থেকে তীব্রতর হয় বায়ু, ঝড় থেকে মহাঝড় বয়ে যায়। কিন্তু পারেন না ওই তৃণকে একটুকু নড়াতে। ব্যর্থতায়, লজ্জায় মাথা নীচু করে ফিরে যান পবনদেব।

এবার আসেন অগ্নি। তেজোদীপ্ত—কিছুটা উদ্ধত যেন ভঙ্গি। যক্ষ বলেন, তুমি আবার কে? কী নাম? করতেই বা পারো কী?

—আমি অগ্নি। এই ত্রিভুবনের সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি আমি!

—তাই! তা পোড়াও তো এত তৃণগাছাকে।

বায়ুর মতোই ভুল করেন অগ্নিও। অহংকারে স্ফীত হয়ে ধিকিধিকি করে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু তাতে কিছুই হয় না তৃণের। তাই ক্রমে প্রজ্বলিত হতে থাকেন অগ্নি। ভীষণ থেকে ভীষণতর

হয় সেই আগুনের তেজ। সেই লেলিহান শিখায় সবকিছুই পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য! সেই তৃণগাছি থাকে সেই একই রকম। বায়ুর মতোই ব্যর্থ হন অগ্নিও। নতমস্তকেই বিদায় নেন তিনি।

বায়ু ও অগ্নির পর একে একে আসেন সব দেবতাই। দেবতারা কিন্তু সেই তৃণগাছির কোনও রূপান্তর ঘটাতে পারেন না। পরাজিত দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ। আর তখনই হয় তাঁদের চৈতন্য। খসে যায় অহমিকার নির্মোক। তাঁরা হন শরণাগত। করজোড়ে বলেন, কে আপনি?

আমিই পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি দুর্গা। মহিষাসুর বধের পর দেবী বন্দনায় তোমরা যাঁকে বলেছিলে ধাত্রী— বিশ্বপ্রসবিণী— বিশ্বপালিনী —আমিই সেই দেবী জগদ্ধাত্রী।

জেনে রাখো, তোমরা কেউ নও। তোমরা সকলে আমারই শক্তিতে বলীয়ান। আমি ইচ্ছা করি— তাই তোমরা শক্তিমান। আমি চাই— তাই তোমরা করো। তোমাদের সব শক্তিরই উৎস আমি— আমি জগদ্ধাত্রী।

এবার দেবতাদের সামনে স্বরূপে আবির্ভূতা হন দেবী জগদ্ধাত্রী। অরুণবর্ণা— প্রসন্নবদনা— ত্রিনয়না দেবী চতুর্ভুজা। তার ওই চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র এবং ধনুর্বাণ। রক্তবসনা দেবী নানা রত্নভূষিতা। সর্প তাঁর উপবীত— যোগ এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক। সিংহবাহিনী দেবীর পায়ের তলায় রয়েছে নিহত করীন্দ্রাসুরের ছিন্ন হস্তীমুণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, মানুষের হৃদয় থেকেই উদ্ভুত হন দেবী জগদ্ধাত্রী। তিনিই মন নামক চঞ্চল হস্তীকে পদানত রাখেন।

শ্রীললিতা সহস্রনামের ১৭৩ শ্লোকে বলা হয়েছে, দেবী হলেন ত্রিপুরসুন্দরী, বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী-বিশালাক্ষী বিরাজিনী প্রগলভা, পরমোদ্বারা পরমাদ্যা মনোময়ী বিশ্বমাতা।

দেবী জগদ্ধাত্রী হলেন সত্ত্বগুণের আধার। অন্যদিকে দুর্গা এবং কালী হলেন যথাক্রমে রজো এবং তমো গুণের প্রতীক। বঙ্গপ্রদেশে আরেক দুর্গাপূজা হিসেবেই পূজিতা হন দেবী জগদ্ধাত্রী। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক কাহিনি।

সেটা অষ্টাদশ শতকের কথা। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরোষে সেবার বন্দি থাকেন রাজ কারাগারে। মুক্তি পান তিনি শারদ বেলায়। প্রতিবারই রাজপরিবারে হতো দুর্গাপূজা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দিতেন দেবীর পায়ে অঞ্জলি। কিন্তু সেবার মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর নৌকা যখন রাজবাড়ির ঘাটে ভেড়ে সেই সময় দেখেন বিসর্জন হচ্ছে দুর্গা প্রতিমার। সাশ্রু নয়নে রাজা সেবার দেবীর পায়ে অঞ্জলি না দেওয়ার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন। সেই রাতেই স্বপ্ন দেখেন রাজা— দেবী বলছেন, ওরে দুর্গা পুজো করতে পারিসনি তো কী হয়েছে। তুই কার্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতে পুজো কর আমায় জগদ্ধাত্রী রূপে। জানিস, আমিই দুর্গা— আমিই জগদ্ধাত্রী। ঘুম থেকে উঠেই রাজ পুরোহিতদের জানান তাঁর স্বপ্নের কথা। সকলেই বলেন, হ্যাঁ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান। রঘুনন্দনও তাঁর তিথিতত্ত্বে লিখে রেখে গেছেন এই পূজার কথা। তাই এ পূজা করা যেতেই পারে। এই বিধান পাওয়ার পরই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন। সেটা সম্ভবত ১৭৬২ সালের কথা। কৃষ্ণনগরের এই জগদ্ধাত্রী পূজা থেকেই বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয় বলে এক কিংবদন্তি রয়েছে। যেমন বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজা কংসনারায়ণের নাম।

বলা হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পূজা দেখেই তাঁর দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাজার অনুমতি নিয়েই চন্দননগরে তাঁর বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তন করেন। আর তারপর থেকেই কৃষ্ণনগর এবং চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারত বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তবে যে কোনও কারণেই রাজার নয় তাঁর দেওয়ানের চন্দননগরের পুজোর জাঁকজমকই বেশি। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুকরণেই এখন বঙ্গদেশের বহু জায়গাতেই জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো হয় জগদ্ধাত্রীর। বারোয়ারি পুজোর মতো বহু পরিবারেও হয় জগদ্ধাত্রীর আরাধনা।

কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরে পুজো প্রবর্তনের সময়কাল নিয়ে রয়েছে কিছু মতভেদ। অনেকের দাবি, কৃষ্ণনগর নয়, চন্দননগরেই সবার আগে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। আবার শিবপুরের মোক্তারবাড়িতে তারও আগে থেকে পুজো হয়ে আসছে এমন দাবিও করা হয়। এসব বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, দুর্গাপুজোর পরে জগদ্ধাত্রী পুজোও ক্রমেই সারা বঙ্গের অন্যতম বড়ো মাতৃ আরাধনার কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

বঙ্গপ্রদেশের মতোই ওড়িশার বারিপদার ভঞ্জপুরেও জগদ্ধাত্রী পুজো হয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে। বসে সেখানে মেলাও।

বঙ্গপ্রদেশ এবং ওড়িশার জগদ্ধাত্রী পুজোর এমন ব্যাপ্তি ও প্রচলন থাকলেও ভারতের অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এই পুজো তেমন ভাবে হতে দেখা যায় না। সেদিক থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো পূর্ব ভারতের একান্ত নিজস্ব পুজো। ■

বঙ্গপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব নবান্ন

স্বপন দাশগুপ্ত

নবান্ন বঙ্গপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। নবান্ন উৎসব হলো নতুন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান পাকার পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলার মাসের অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) নবান্নের ফসল উৎসব। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু চাল উৎপাদক অঞ্চলের এটি একটি অতি জনপ্রিয় উৎসব বা অনুষ্ঠান। এটি বিশেষ করে দেবী লক্ষ্মীকে (যিনি সম্পদ ও উর্বরতার প্রতীক) আবাহন করে পালন করা হয়।

কোথাও কোথাও মাঘ মাসে নবান্ন উৎসবের প্রথা আছে। নবান্ন অনুষ্ঠানে নতুন অন্ন পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং সমস্ত পশুপক্ষী কাক ইত্যাদি প্রাণীকে উৎসর্গ করে এবং আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের পরিবেশন করার পর গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করেন। নতুন চালের খাদ্য সামগ্রী কাককে নিবেদন করার নবান্ন উৎসবের একটি বিশেষ লৌকিক প্রথা ছিল। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃতের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। ওই নৈবেদ্যকে বলে 'কাকবলী'। অতীতে পৌষ সংক্রান্তির দিনেও গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করা প্রথা। হিন্দুশাস্ত্রে নবান্নের উল্লেখ ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী নতুন ধান উৎপাদনের সময় পিতৃপুরুষ অন্ন প্রার্থনা করে থাকেন। শাস্ত্রমতে নবান্ন উৎসব পালন না করে নতুন অন্ন গ্রহণ করলে পাপের ভাগী হতে হয়।

একদা অত্যন্ত সাড়ম্বরে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হতো, কালের বিবর্তনে গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব জাঁকজমক হারিয়েছে। তবে এখনও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় এই উৎসব অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপ জেলার শালগ্রামসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে আবহমানকাল ধরে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৫টি শস্যোৎসব প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ— মকরসংক্রান্তি সমগ্র ভারতের হিন্দুদের একটি শুভ উৎসব। লহরি— পঞ্জাবের শস্যোৎসব। অসমের বিহু— আনন্দ ও উৎসাহের শস্যোৎসব।

'নেয়ো খাই' পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের খাদ্যদ্রব্যের উপাসনার অনুষ্ঠান।

'ওনাম' দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ফসল তোলার উৎসব।

হাওড়া সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মানুষ খাদ্যোৎসবে শুধুমাত্র মেলা দেখার জন্য সমবেত হন না, তাঁরা বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, যেমন পিঠে মেকিং (বিভিন্ন পিঠে পুলি তৈরির প্রতিযোগিতা) বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবীণ নাগরিকদের হাঁটা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিভিন্ন স্টলে কৃষকদের নিকট সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের ধান, পাটিসাপটা, জিলিপি নতুন সংযোজনী বেগুনি— পায়েস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বাউল গান, ছৌনৃত্য, যাত্রা, তরজা, কবিগান ইত্যাদি বাংলার বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। গ্রামীণ কারিগরদের তৈরি হস্তশিল্প সংগ্রহ করার এক দুর্লভ সুযোগ।

শীতের শুরুতে এই খাদ্যোৎসব পালন করা হয়। এই সময় বাঙালির রান্নাঘরে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ঠিক যেমন দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী। এক পরিবার অন্যের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। বর্তমানের এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এখনও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

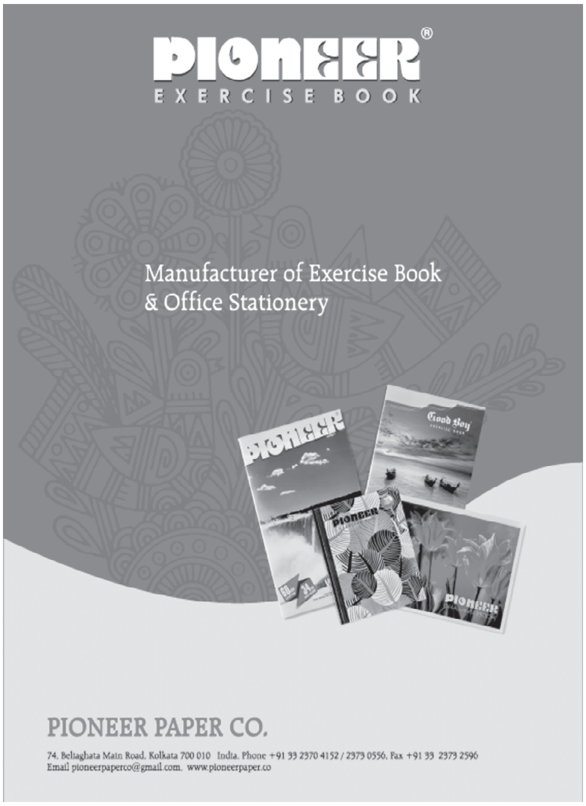

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

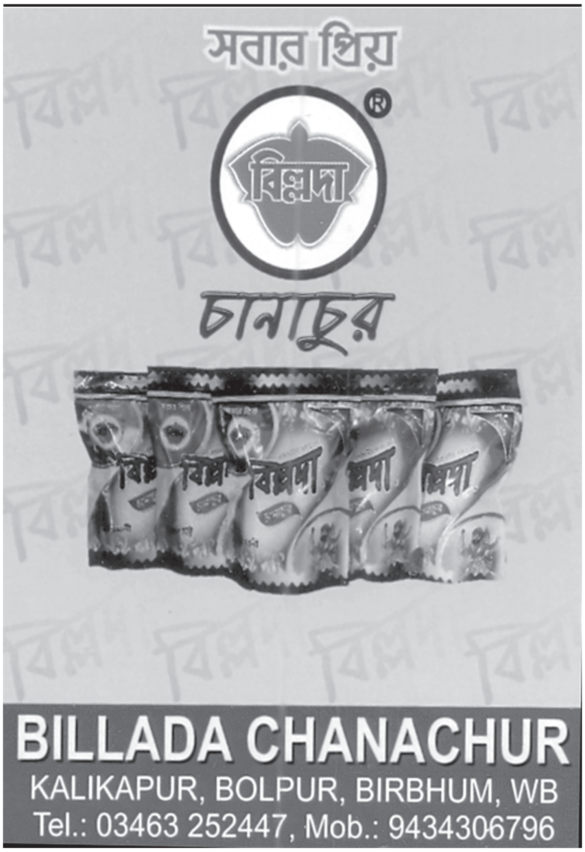

সমাপন

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

এই 'শনিবারের হাট' এখন সুবিখ্যাত হয়ে উঠেছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। চলছে বিকিকিনি। সামনে খোয়াই। একটু দূরে একটা নাম-না-জানা গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে রয়েছে। রায়া নিঃশব্দে চেয়েছিল। পাশে পলাশ বসে। পলাশ প্রায়ই বলেন— এই জগৎ এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল। সর্বশক্তিমান সেই ঐন্দ্রজালিক। ছেলেবেলায় রায়ার নিবিড় বিশ্বাস ছিল ভগবানের উপর। এখন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে— এ যুগেও কি তুমি রয়েছ ঈশ্বর?

পলাশ বলেন— পৃথিবীতে এখনও এমন সুন্দর কত জায়গা আছে তাই না?

রায়া বলে— এখানে এলেই মন ভালো হয়ে যায়।

পলাশ নিঃশব্দে হাসেন। কত স্বপ্ন ছিল তাঁর মেয়ের! সেই তরুণীবেলা থেকে রাজনীতি করত। পলাশ জানেন যে, ক্ষমতার লোভ

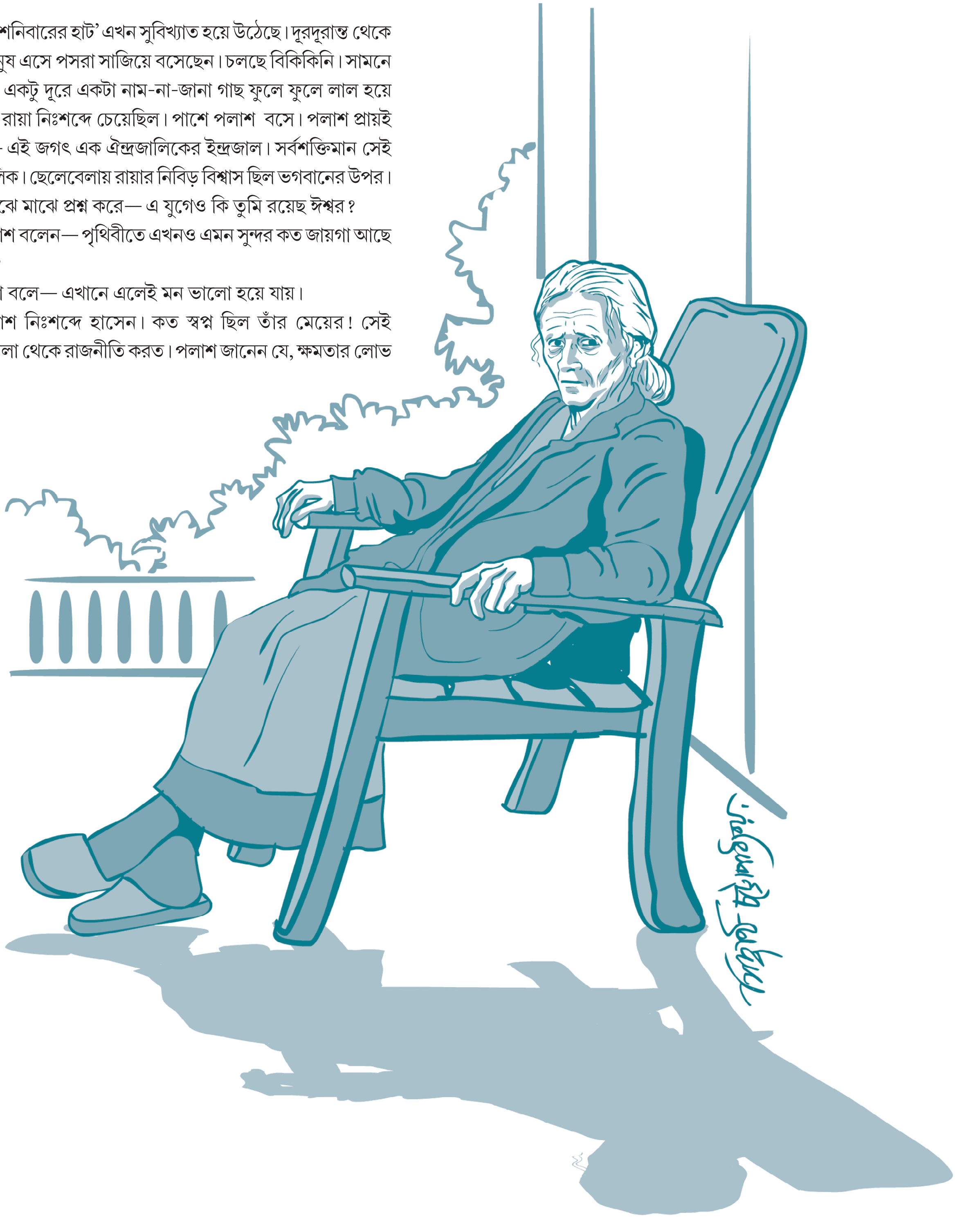

ওর কোনওদিন ছিল না। শুধু এ রাজ্যটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল।

আজ ও রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে।

একটু আগে রতনপল্লীর বাড়িতে ফিরে এসেছে রায়া। হালকা সবুজ রঙের লং টপ, কমলা লেগিংস, ছোট্ট কপালে সবুজ টিপ।

ললনা দরজা খুলে মহাখুশি— বেশ করেছিস সকাল সকাল ফিরে এসেছিস। বোস। শরবত করে দিই।

দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছে ললনা।

বেতের সোফায় বসে সামনে ডিভানে বসা পলাশের দিকে চেয়ে রায়া নিভন্তস্বরে বলেছিল— রাজনীতি ছেড়ে ছিলাম বাবা।

নিমেষে অনাবিল সুখে ভরে গিয়েছিল পলাশের বুক। তবু বিস্ময়ের সুরে বলেছিলেন— কেন?

রায়া নিচু গলায় বলেছে— অন্যায় সহ্য করে কতদিন থাকা যায় বাবা?

রায়া জানলা দিয়ে বাগানের রাধাচূড়া গাছটির দিকে চেয়ে বলে উঠেছে— আর রাজনীতি করব না। আবার গল্প লিখব। গান শুনব। পড়ব। কত শখ ছিল আমার।

ললনা ঘরে ঢুকেছিল। দু' হাতে দুটো কাচের গ্লাসে শরবত।

পলাশ এক চুমুকে শরবত খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছিলেন। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে বলেছিলেন— চল্ খোয়াইয়ের কাছ থেকে ঘুরে আসি। শনিবারের হাটও দেখা হবে।

ললনা বলেছিল— বেশি রাত করো না। রুবিও ঘরে নেই।

খোয়াই রায়ার বড়ো প্রিয়। সুযোগ পেলেই এখানে আসে।

পলাশের অবশ্য ভারতবর্ষের যে-কোনও প্রান্তরই ভালো লাগে। সারা দেশই তার বড়ো প্রিয়।

এখন নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলেন— তোকে এবার কাশ্মীর নিয়ে যাব। দেখবি, আমাদের দেশ কত সুন্দর।

রায়া নাম-না-জানা গাছটির দিকে চেয়ে বলে— সেখানে গেলেও হয়তো মনে হবে খোয়াই আরও সুন্দর। আমি যে এই রাজ্যটাকে ভালোবাসি বাবা।

—আর দেশকে ভালোবাসিস না?

রায়া লজ্জা পেয়ে বলে— বাসি তো!

তাদের থেকে সামান্য দূরে এক জোড়া তরুণ-তরুণী এসে বসল। পলাশ বললেন— এবার ওঠা যাক। তোর মা চিন্তা করবে।

রায়া উঠে দাঁড়ায়— চল।

সামান্য হেঁটেই ওরা টোটো পেয়ে গেল।

টোটোয় আর কোনও যাত্রী নেই। বাবার করা সেই প্রশ্ন বারংবার মনে ভেসে আসে রায়ার— এবার কী করবি?

রায়ার সামনে আরেকটি পথ খোলা আছে। রাজনীতিতে আসার আগে সে গল্প লিখত, বছর তিনেক আগে, ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় তার মোবাইল বেজে উঠেছিল। অচেনা নম্বর দেখে রায়া বিস্মিত হয়েছিল।

—হ্যালো!

ও প্রান্তে অপরিচিত কণ্ঠ বলেছিল— নমস্কার।

—নমস্কার।

—আমি পারিজাত বসু বলছি, সম্প্রতি কয়েকটা টিভি সিরিয়াল পরিচালনা করেছি। আপনার সদ্য প্রকাশিত গল্পটি আমার ভালো লেগেছে। 'সন্ধ্যার মেঘমালা' গল্পটি। কাহিনিটি নিয়ে একটা সিরিয়াল করতে চাই। অবশ্যই আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

সে আপত্তি করেনি।

দূরদর্শনের পর্দায় রায়া দেখেছিল তার গল্প নবরূপ ধারণ করেছে। সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। চরিত্রগুলো ঠিক থাকলেও পরিচালক কাহিনিটি অনেক বদলে দিয়েছিলেন।

সে আবার লিখবে। রাজনীতি তার পথ নয়। কত সমস্যা মানুষের। অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান তার আয়ত্তের বাইরে।

সে বলে— বাবা, গল্প লিখে মানুষের সমস্যা দূর করা যায় না?

পলাশ রাস্তার দিকে চেয়েছিলেন। সচকিত হয়ে তার দিকে চোখ ফেরানো— যায়। অবশ্যই যায়!

টোটো বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, গেট খুলে বাগানে পা দিতেই ললনা বারান্দা থেকে বলেন— তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভালো করেছিস, আয়।

রায়া নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

।। দুই ।।

ললনা হৈ হৈ করে উঠলেন—রুবি! কাল সন্ধ্যেবেলা ফোন করলাম। আজ আসবি বললি না তো?

রুবি হাসতে হাসতে বলে— ভাবলাম হঠাৎ এসে তোমাদের অবাক করে দেব।

—বেশ করেছিস। তোদের বাবা একটু বেরিয়েছে। ফিরে এলেই বাজারে পাঠাব। বোস্।

ললনা ব্যস্ত পায়ে রান্নাঘরের দিকে যায়।

রুবি সোফায় হেলান দিয়ে রায়ার দিকে তাকায়— এখন কী করছিস রে দিদি?

রায়া হাসে— লিখছি। কয়েকটা গল্প একজন পরিচালকের কাছে পাঠালাম। তোর খবর কী? পরীক্ষা তো ভালো হয়েছে।

—দিদি তোকে একটা খবর দিই। আমি স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছি। বাবাকেও আজই জানাব।

রায়া নিভে যাওয়া স্বরে বলে—আর এদেশে ফিরবি না।

—মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসব। কত সুযোগ-সুবিধা ওখানে। তোর এত ভালো রেজাল্ট। একটু চেষ্টা করলেই তুইও ওদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবি।

—আমি যে এদেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না রুবি!

রুবি হাসতে হাসতে বলে— কী আছে এদেশে?

রায়া ওর চোখে চোখ রেখে বলে— আমাদের মা তো অনেককিছু জানে না। নাচ শেখেনি, গানও জানে না। সেজন্য মাকে কি তুই কম ভালোবাসিস?

—তাই কি হয়?

—দেশও তো মায়ের মতো! সুযোগ-সুবিধা নেই বলে এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা কি ভাবা যায়?

রুবি সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে ওঠে— তোর মতো যদি এ দেশকে এত ভালোবাসতাম দিদি তাহলে আমিও আমেরিকা থেকে চলে আসতাম। কিন্তু আমি যে এত ভালোবাসি না। বাবা কি রাগ করবেন?

—না রে! বাবা তো আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

রায়ার মোবাইল বেজে ওঠে। সে ফোন ধরে বলে— নমস্কার।

—নমস্কার! আমি পারিজাত বলছি। দেখুন, মা-কাকিমারাই মূলত

ধারাবারিকগুলির দর্শক।

রায়া বলে ওঠে— কিন্তু নতুন প্রজন্মও তো টিভি দেখে!

—ওরা সিরিয়াল কমই দেখে। বিয়ে নিয়ে সমস্যা, শাশুড়ি বৌয়ের রেষারেষি, এসবই আমাদের দর্শক পছন্দ করে। আপনার গল্পগুলো ভালো। তবে নতুন কিছু করার সাহস আমাদের নেই।

রায়া নিভন্ত স্বরে বলে— আচ্ছা, ঠিক আছে। সে মোবাইল সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখে।

রুবি বলে— কী হলো?

রায়া হাসে— আমার গল্প নিয়ে ওরা সিরিয়াল করতে পারবে না।

—তাতে কী হয়েছে। এত ভালো গল্প তোর, ঠিক কোনও ব্যবস্থা হবে।

দরজায় পায়ের শব্দ। রায়া ফিরে তাকায়, বাবা।

সে বলে— বাবা! রুবি এসেছে।

—বাবা এগিয়ে আসে। ডিভানে বসে বলে— ভালো করেছিস রুবি। আজ তোদের 'সবুজ বন'-এ নিয়ে যাব, কিন্তু একটা খবর পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল রে! রেবাদিকে তোর মনে আছে, রায়া?

—কোন রেবাদি?

—তুই ছোটোবেলা পড়তিস!

রায়ার মনে পড়ে। রেবাদি, মানে রেবা মিত্র রায়ার গৃহশিক্ষিকা ছিলেন। খুব ছোটোবেলা ওঁর কাছে পড়েছে রায়া।

পলাশ বলেন— রেবাদি নয়দিন ধরে অসুস্থ। ছেলে-মেয়ে দুজনেই আমেরিকায়। এতদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কাল ছেড়ে দিয়েছে। উনি হাসপাতাল ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না। খুব কাঁদছিলেন। ছেলে, মেয়ে দুজনেই কাছে নেই। একা ঘরে থাকতে ওর ভয় করে।

জানলা দিয়ে বাগানের ধুলো-মাখা, শীর্ণ নাগকেশর গাছটার দিকে চেয়ে রায়া ভাবে, অনেক সমস্যার সমাধান তার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু যেটুকু তার হাতে আছে তা তো করতে পারে। সে কিনা নিছক গল্প লিখে মানুষের সমস্যার সমাধান করবে ভেবেছিল!

।। তিন ।।

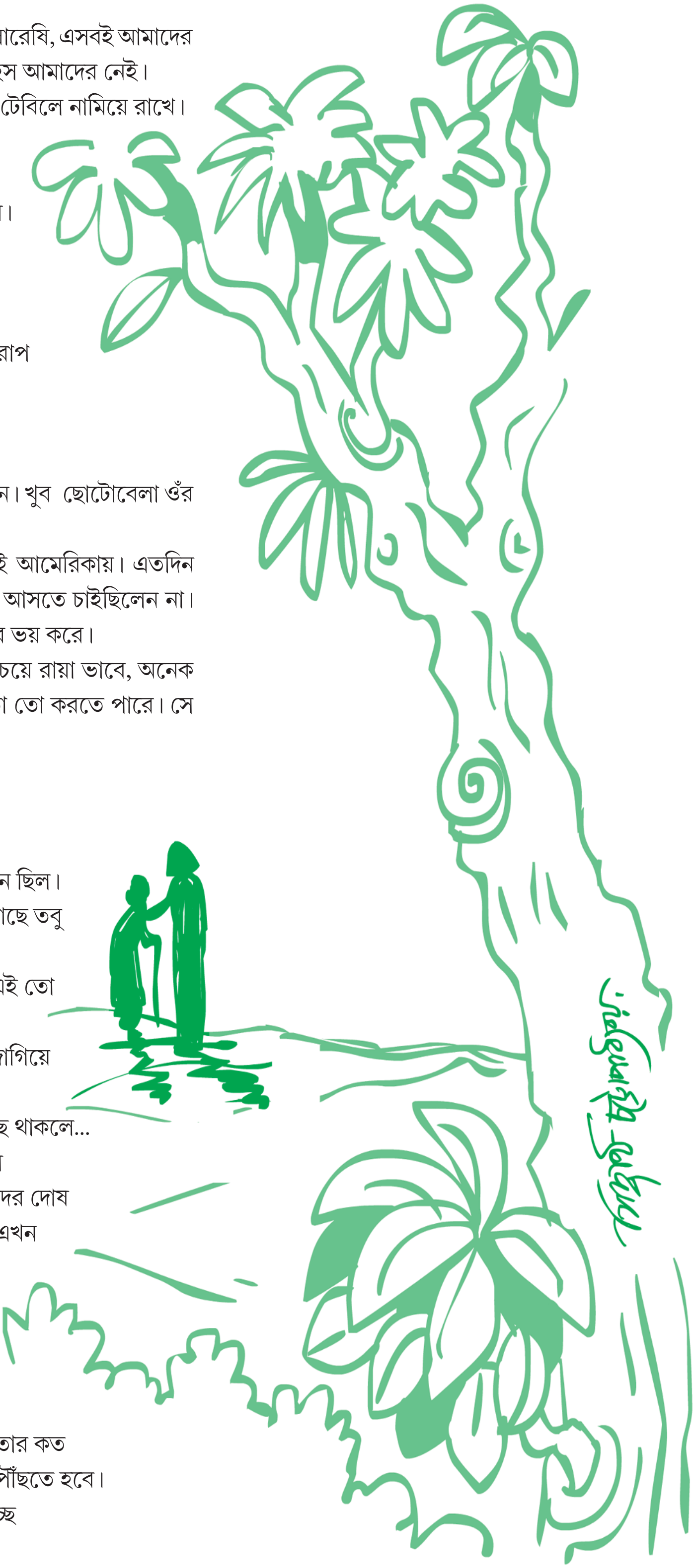

এ বাড়িতে রায়া পাঁচদিন ধরে আসছে। সামনে এক সময় সুন্দর বাগান ছিল। এখন গাছগুলো আছে। যত্ন করার লোক নেই। দু-একটা অযত্ন-লালিত গাছে তবু ফুল ফুটেছে। রায়া গেটের কাছ থেকে চোখ তুলে দেখে বারান্দায় লাল ফাইবারের চেয়ারে বসে রেবাদি। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে— এই তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আজ চমৎকার দেখাচ্ছে।

রেবাদি হাসেন—সুস্থ না হয়ে উপায় আছে? আর কত রাত তোকে জাগিয়ে রাখব?

সেরে না উঠলে আজ রাতও তো তুই জাগতিস। বুবাই-তিতির কাছে থাকলে... বলতে বলতে তিনি থেমে যান। বুবাই? সে তো সেই কবে ইংল্যান্ড চলে গেছে। তারপর আমেরিকায়, তিতিরও তাই। কথা হয়। দেখা হয় না। ওদের দোষ নেই। আসার সুযোগ পায় না। তাঁর সমস্যা রোগ নয়। নিঃসঙ্গতা। রায়া এখন তার আরেকটা মেয়ে।

তিনি নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলেন— আমি কত সেলাই করতাম দেখবি? রায়া হৈ-হৈ করে ওঠে— নিশ্চয়ই দেখব। সেলাই দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

রেবাদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান—আয়।

রেবাদির পিছু-পিছু নিঃশব্দে যেতে যেতে রায়া ভাবে, রেবাদি আজ তার কত আপনজন। এমন কত নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছেন, তাঁদের কাছে তাকে পৌঁছতে হবে। সে ভুল পথে যাচ্ছিল। ঈশ্বর ঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সহসা মনে হচ্ছে ঈশ্বর নিছক এক ঐন্দ্রজালিক নয়, এক মস্ত বড়ো কাহিনিকার। তারা সবাই সেই কাহিনিকারের রচিত এক-একটি চরিত্র। কী সুন্দর তার রচনা। খুব ভালো লাগছে এই দেশকে, ঈশ্বরকে, জীবনকে।

জবাফুল

ফুল যেমন মানুষের প্রিয়, তেমনি দেব-দেবীদেরও প্রিয়। দেব-দেবীরাও ফুলের গন্ধে খুশি হন। মানুষের মতো তাঁদেরও কিছু কিছু বিশেষ ফুল প্রিয়।

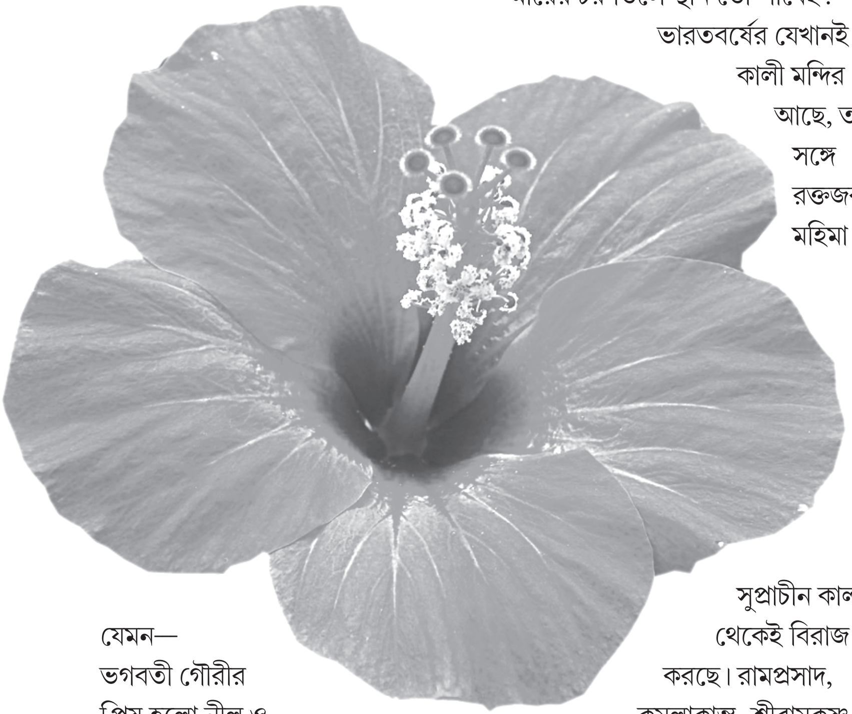

যেমন— ভগবতী গৌরীর প্রিয় হলো নীল ও শ্বেতপদ্ম। শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হলো পদ্ম, মালতী,বৈজয়ন্তী। লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় পদ্ম। শিবের প্রিয় হলো ধুতুরা, নাগকেশর। মা কালীর প্রিয় ফুল জবা।

কালীপুজোয় আমরা মাকে রক্তজবা অর্পণ করি। তাঁর গলায় পরাই জবাফুলের মালা। তাঁর চরণে প্রার্থনা জানিয়ে আমরা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করি। আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, মা কালীর প্রিয়ফুল জবা কেন? পুরাণে এ সম্পর্কে সুন্দর একটি বর্ণনা রয়েছে। জবা মা কালীর একজন ভক্ত ছিলেন। মা কালী ধর্মসংস্থাপনের জন্য দুষ্টের দমন করতে উদ্যত হলে জবা তখন তাঁর পাপড়ির লাল রং মায়ের দু'চোখে দান করে। তা দিয়ে মা তাঁর রক্তচক্ষু দেখিয়ে শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। যার এত গুণ সে মায়ের চরণতলে স্থান তো পাবেই!

ভারতবর্ষের যেখানেই কালী মন্দির আছে, তার সঙ্গে রক্তজবার মহিমা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিরাজ করছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্যামাক্ষ্যাপা প্রমুখ মহাসাধক মা কালীকে মঠো মুঠো রাঙাজবা দিয়ে পুজো করেছেন। মা কালীর গলায় জবার মালা পরিয়ে গানে, ভক্তিতে পুজো করেছেন। তার জন্য মা তাঁদের সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছেন। মাতৃসাধক কাজী নজরুল জবাকেই প্রশ্ন করে গান বেঁধেছিলেন— 'বলরে জবা বল, কোন সাধনায় পেলিরে তুই মায়ের চরণতল।' সত্যি এই গানের কোনও তুলনা হয় না। মাতৃভক্ত কবি বলেছেন— 'কবে তোরই মতো রাঙবে রে মোর মলিন চিত্তদল।' মায়ের পায়ে জবার আত্মনিবেদন আরেক কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে— ' আমারে লইয়া খুশি হও তুমি ওগো দেবী শবাসনা/ আর চাহিয়ো না মানব শোণিত, আর তুমি চাহিয়ো না।'

জবা হলো মনের প্রতীক। তাই জবাফুলকে বলা হয় মনোফুল। তাই মনের প্রতীক হিসেবে ভক্তরা জবাফুল মায়ের গলায় বা চরণে নিবেদন করে। এতে মায়ের চরণযুগল বা মায়ের মূর্তি যেমন মনোহর হয়ে ওঠে তেমনি ভক্তির আনন্দে ভক্তের চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। তখন চোখের কোণে দেখা দেয় অশ্রু। সে অশ্রুর বাঁধ যে মানে না। তাই কবি গেয়েছেন— ' রাঙা পায়ে রাঙাজবা তেমন সেজেছে, চরণদুটি ঘিরে আমার মন মজেছে।' মা কালীর প্রিয় জবাফুল প্রকৃতপক্ষে আমাদের মন, বুদ্ধি, চিন্তা, শুভ সংকল্প কল্পনা করে মালা গেঁথে মায়ের গলায় পরাতে হবে, আর তাহলেই আমাদের আত্মিক উন্নতি ঘটবে, মনে শান্তি, সুখ ও আনন্দ আসবে। নচেৎ শুধু রাশি রাশি জবাফুলের মালা গেঁথে কিংবা বাজার থেকে কিনে মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেও কোনও কাজ হবে না।

তাই জবাফুলের মালার সঙ্গে মনোজবার মালা গেঁথে মাকে যে পরাতে পারবে, মায়ের চরণে যে নিজেকে সঁপে দিতে পারবে তারই জীবন সার্থক হবে। মায়ের চরণে জবার মতো আমাদেরও বিনম্র হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে পড়ে থাকতে হবে। সাধক কবি গানের দ্বারা মাকে আত্মনিবেদন করেছেন— 'আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, ও তার গন্ধ না থাক যা আছে তাই নয়রে ভুয়ো আবরণ।'

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

তিরুবনন্তপরম্

তিরু-অনন্ত-পুরম্ অর্থাৎ পবিত্র অনন্তনাগের শহর। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী পদ্মনাভপুরম্ থেকে স্থানান্তরিত হয় তিরুবনন্তপুরমে। ইংরেজদের উচ্চারণে এক সময় হয়েছিল ত্রিবান্দম্। বর্তমানে কেরল রাজ্যের রাজধানী। বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে রয়েছে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির। বিগ্রহ অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণ। মাথার ওপরে ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করে অনন্তনাগ, আর পায়ের কাছে দেবী লক্ষ্মী, মাথায় ধরিত্রী। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের গৃহদেবতা পদ্মনাভস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণু। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে একের পর এক যুদ্ধ জয় করে রাজা মার্তণ্ড বর্মা সমগ্র রাজ্য দেবতার নামে উৎসর্গ করে নারায়ণের দাসরূপে কাজ করেন। সারা শহরে অজস্র মন্দির আর দর্শনীয় স্থান। সারা বছর পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।

জানো কি?

- ২০১৮-তে কমনওয়েলথ গেমসের মটো ছিল 'শেয়ার দ্য ড্রিম।
- কমনওয়েলথ গেমসের মূল কেন্দ্র লন্ডন।
- বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম লুইস মার্টিন।
- ২০১০-তে ভারত ২০১ টি পুরস্কার পেয়েছিল ।
- ২০১৮-তে ভারতের র‍্যাংক ছিল তৃতীয়।
- ২০১৮-তে শুটিংয়ে ভারত বেশি পদক পেয়েছে।
- ২০১৮-তে একমাত্র স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অ্যাথলেটিক নীরজ চোপড়া।

ভালো কথা

চীনের বাজি পটকা নয়

কালীপুজোর সাতদিন আগে থেকে খেপাকাকু পাড়ায় পাড়ায় হ্যান্ডমাইকে চীনের তৈরি বাজি পটকা কেউ যেন না কেনে তার আবেদন করছিল। প্রথম প্রথম আমরা বুঝতে পারিনি। খেপাকাকু সুন্দর করে বলছিল যে, চীন আমাদের শত্রুদেশ। সবসময় আমাদের দেশের ক্ষতি করার তালে আছে। বাজি পটকার মাধ্যমে নানা রকমের রোগের জীবাণু ছাড়তে পারে। তাছাড়া, চীনের তৈরি ওসব কিনলে আমাদের এখানে যেগুলি তৈরি হয় সেগুলো বিক্রি হবে না। তাতে গরিব মানুষরা কাজ হারাবে। খেপাকাকুর এই অভিযানকে সবাই ভালোভাবেই নিয়েছে। আমাদের পাড়ায় কেউ এবার চীনের তৈরি বাজি কেনেনি। চম্পাহাটির তৈরি বাজি আমরা ফাটিয়েছি। আর মাটির প্রদীপে দেওয়ালির আলো জ্বালিয়েছি।

অঞ্জনা সাহা, দশম শ্রেণী, ধুলিয়ান। মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

স্বপ্নে

হিমাদ্রিশেখর রায়, একাদশ শ্রেণী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।

কখনো আমি উড়ে চলেছি কোথায় তা জানি না
কখনো অতল জলে ডুবে চলেছি তাও জানি না।
কখনো দূর গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে চিনে ফেলেছি
কখনো ভিন দেশে গিয়ে মনে হয় এসব আগেও দেখেছি।
মা বললেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসব খুবই ভাবিস
মনের ভাবনা স্বপ্ন হয়ে এদের তুই দেখে থাকিস।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ২৯

অভিমন্যু তখন নিরস্ত্র, কিন্তু অদম্য। ভাঙা রথের চাকাটি তুলে নেয়।

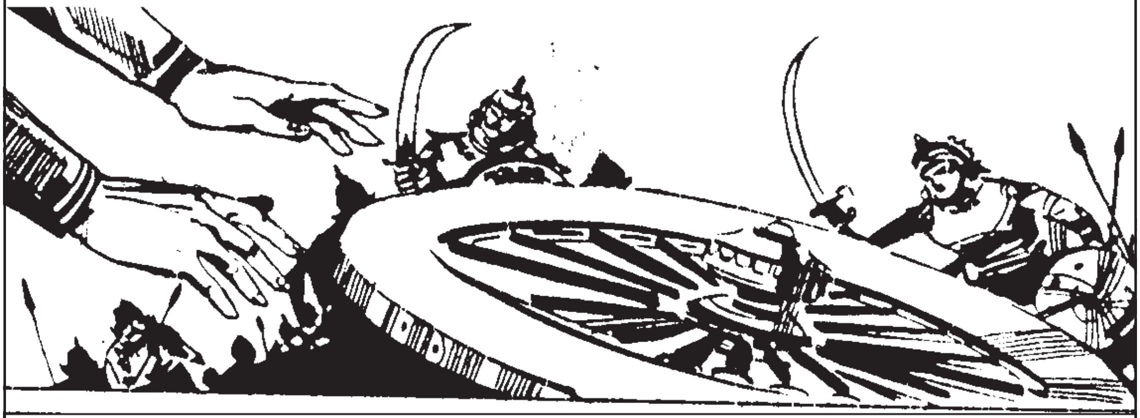

অন্যায় যুদ্ধ প্রতিরোধ করে। কিন্তু তাকে ঘিরে ফেলা হয়।

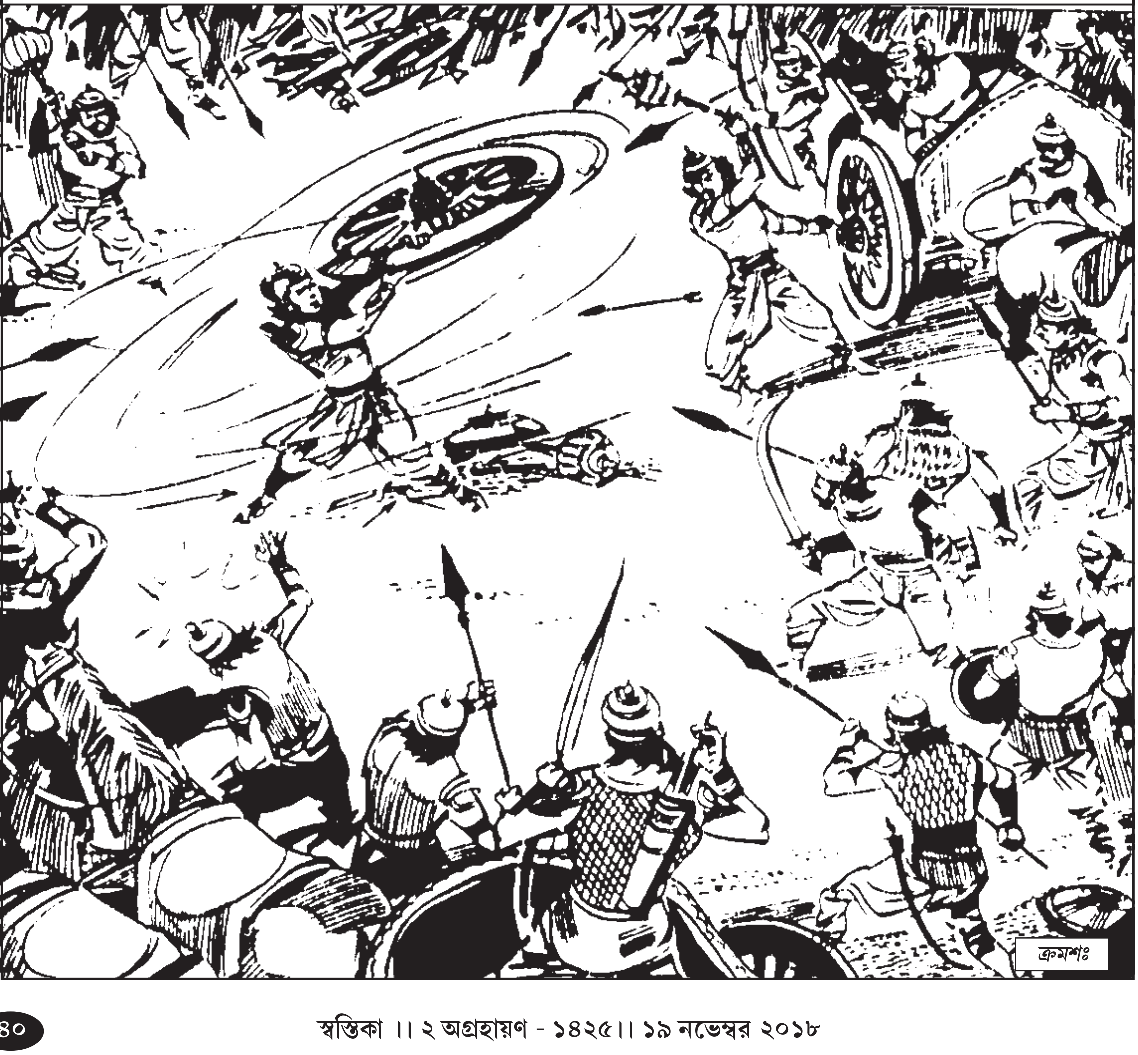

ক্রমশঃ

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইনি পদক্ষেপ

সৌমী দাঁ

এই পারিবারিক হিংসা আইন সংক্রান্ত পূর্বের দুটি পর্বে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারা এই আইনে সুবিধা পেতে পারেন, কোথায় দরখাস্ত করতে হবে, কী কী সুবিধা অভিযোগকারিণী পেতে পারেন। কী ধরনের সুবিধা পেতে পারেন ও আর্থিক সাহায্য কী পেতে পারেন সেসব বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে।

এই আইনের আওতায় অভিযোগ দাখিলের পর অভিযোগ কীভাবে নিষ্পত্তি হয়, কতদিনে তা নিষ্পত্তি হয় এবং অভিযুক্তের জন্য শাস্তির কী বিধান, মহিলারা কী কী ধরনের প্রোটেকশন পেতে পারেন এগুলি এই পর্বে আলোচনা করা হবে। এছাড়া কিছু লিগ্যাল টার্ম আছে যেমন— Shared household, কম্পেনসেশন অর্ডার কী এগুলি আলোচনা করা হবে।

এই আইনে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা : অভিযোগকারী মহিলা লিখিত ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দাখিলের তিনদিনের মধ্যে প্রথম শুনানির দিন ধার্য করা হয়। আবেদনকারী বা অভিযোগকারী মহিলা যে বিষয়ে সুরাহা চান সেটি প্রথম শুনানির দিন থেকে ষাট দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত আদেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন।

এই আইনে সুরক্ষা নির্দেশ (Protection order) কী?

অভিযোগকারী মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট অপরপক্ষকে বা অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরার নোটিস দেবেন। অপরপক্ষ রাজি হলে দু'পক্ষের তরফ থেকে শুনানি হবার পর যদি ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক ভাবে সন্তুষ্ট হন যে পারিবারিক নির্যাতন মহিলাটির সঙ্গ ঘটেছে তাহলে পরিস্থিতি বিচার করে নির্যাতিত মহিলার সুরক্ষার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। এই অর্ডার বা ডাইরেশানে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি থাকবে—

(১) আর কোনও পারিবারিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাবেন না।

(২) পারিবারিক হিংসার ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করবেন না বা উৎসাহিত করতে পারবেন না।

(৩) অভিযোগকারী বা নির্যাতিতার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ অভিযুক্ত রাখবে না।

(৪) নির্যাতিতা মহিলার কোনও সম্পত্তি, টাকা পয়সা, স্ত্রীধন, যৌথ সম্পত্তির লেন দেনের ওপর স্থগিতাদেশ দেবে ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর হবে না।

(৫) নির্যাতিতা বা অভিযোগকারী মহিলা যদি কর্মরতা হন তাহলে নির্যাতনকারী তাঁর কর্মস্থলে যেতে পারবেন না। কোনও শিশুকে নির্যাতন করলে তার স্কুলে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কোর্ট।

(৬) নির্যাতিতা মহিলার ওপর নির্ভরশীল কোনও ব্যক্তি, শিশু, মহিলাকে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধে সাহায্য করেছেন এমন ব্যক্তির ওপর অত্যাচার করা চলবে না।

(৭) এছাড়া সুরক্ষা নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী নির্যাতনকারীর আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের ওপরও নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করতে পারেন।

সুরক্ষা নির্দেশ পাওয়ার করণীয়?

নির্যাতিতা মহিলা নিজে, সুরক্ষা অফিসার, অথবা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মহিলার হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগপত্র করতে পারেন। অভিযোগ পেতে কী কী সুরাহা চাইছেন তা লেখা থাকবে।

প্রোটেকশন অফিসার ও তার দায়িত্ব : রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলায় প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলাদের সাহায্যের জন্য প্রোটেকশন অফিসার নিয়োগ করবেন। এঁরা এই আইনটি মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বলবৎ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করবেন।

প্রোটেকশন অফিসার প্রধানত ডোমেস্টিক ইনসিডেন্ট রিপোর্ট তৈরি করে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেবেন এবং অন্য একটি কপি সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় দাখিল করবেন। এক কপি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে দেবেন।

নির্যাতিতা মহিলার যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা, আইনি পরিষেবা ঠিকমতো উপভোগ করতে পারছেন কিনা তা দেখবেন। সার্ভিস প্রোভাইডার বা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর একটি তালিকা প্রোটেকশন অফিসারের কাছে থাকবে। আদালতের নির্দেশে মহিলার বসবাসের ব্যবস্থা করা বা তার ডাক্তারি পরীক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্যাতিতা মহিলার আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ হলে সেই নির্দেশ পালন হচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে হবে প্রোটেকশন অফিসারকে।

(লেখিকা একজন আইনজীবী)

অন্য রকম

অভাবী শিশুদের স্বপ্নপূরণের কারিগর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দিনটা ছিল শুক্রবার। মে মাসের ২৫ তারিখ। সময় বিকেল সাড়ে চারটার আশপাশ হবে। প্রতি দিনের মতোই খদ্দেরের জন্য চা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় বেজে ওঠলো মোবাইল ফোন। ফোন ওঠাতেই শুনতে পেলেন 'আপনি কি কটকের মিস্টার প্রকাশ রাও? আমি পিএমও অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর অফিস থেকে বলছি। মোদীজী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। সেজন্য আগামীকাল আপনি পড়ান এরকম কয়েকজন বাচ্চাকে নিয়ে দুপুর দুটোয় কটকের কিলা ময়দানে আসুন। আপনি পড়ান সেই বাচ্চাদের কয়েকজনের নাম বলবেন?' ফোনে তিনি

তাঁর ছাত্রদের বেশ কয়েকটি নাম বলে দিলেন। তারপরেই তাঁর মনে হলো কেউ তাঁর সঙ্গে মজা করছে না তো? পরে পরে জেলার বিভিন্ন অফিসারদের ফোন আসায় আর নিছক মজার ব্যাপার বলে মনে হয়নি। সবাই একই কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

তারপর ২৬ মে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী জেলা অধিকারী তাঁকে নিয়ে কিলা ময়দানের সভায় উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন মন্ত্রী ও পদাধিকারী তাঁর কাজের প্রশংসা করে উৎসাহিত করলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তাঁর সামনে এসে বললেন,' আমি আপনার সম্পর্কে সব জানি, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' এটা শুনে ভদ্রলোকের মনে হলো তিনি স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ও তাঁর ছাত্রেরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের খোঁজখবর নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশোনা কেমন চলছে। ভবিষ্যতে কী হতে চায় আরও কত কী। সবাই কথা বলল মন খুলে। প্রধানমন্ত্রী হাসতে লাগলেন।

না, এটা কোনও গল্পকথা নয়। ওড়িশার কটক শহরের যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরা সবাই ৬১ বছরের প্রকাশ রাওকে জানেন। তিনি গত ১৮ বছর ধরে অবহেলিত গরিব শিশুদের পড়াশুনা শিখিয়ে বড়ো করার কাজ করে চলেছেন। স্থানীয় বক্সীবাজারে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চায়ের দোকান চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করছেন। আয়ের অর্ধেক শিশুদের শিক্ষা ও খাওয়ার জন্য ব্যয় করেন। ফলস্বরূপ, এখন পর্যন্ত ৩৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ওড়িশার ভালো ভালো স্কুলে পড়াশুনা করছে। কয়েকজন জেলা ও রাজ্যস্তরের খেলায় মেডেল পেয়েছে।

প্রকাশ রাওয়ের জীবনকাহিনি যতটা আকর্ষণীয় ততটাই সংঘর্ষময়। তা সত্ত্বেও তিনি অবহেলিত গরিব শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে চলেছেন। তাঁর কথায়, বাবা সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ফিরে এসে কটকে চায়ের দোকান খোলেন। আমাকে সেই দোকানে কাজ করতে হতো। সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করতাম। ডাক্তার হবো ইচ্ছা ছিল। অভাবের তাড়নায় সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই শিশুদের মধ্যে দিয়ে আমি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।' তিনি বললেন, প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ১৭ বছর বয়সে প্যারালিসিসে আক্রান্ত হই। কটকের ভীমচন্দ্র মেডিক্যালে ভর্তি হলে জানা গেল শিরদাঁড়ার মধ্যে টিউমার ও টিবি হয়েছে। অপারেশনের জন্য রক্তের দরকার। কিন্তু পরিবারে রক্ত দেবার মতো কেউ ছিল না। সেই ১৯৭০ সালে এত সচেতনতা না থাকায় কেউ রক্ত দিতেও রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় কেউ একজন রক্ত দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচায়। তখন মনে মনে ঠিক করেছিলাম রক্ত দানের সচেতনতা বাড়াতে হবে।'

বক্সীবাজারের লোকেরাই জানালেন, প্রকাশ রাও এখন পর্যন্ত ২১৫ বার রক্ত দিয়েছেন। প্লেটলেটসের জন্য দিয়েছেন ১৭ বার। তিনি বললেন, 'বাবা গত হওয়ার পর দোকানের দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ে। তখন দেখতাম আশেপাশের বস্তির ছেলে-মেয়েরা অভাবের জন্য পড়াশুনা করতে পারছে না। ওদের দেখে আমার নিজের কথা মনে পড়ে যেত। প্রথমে ১৫ জনকে বাড়িতে ডেকে পড়াতে শুরু করি। ক্রমে সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। দু'ঘণ্টা পড়াতাম, বাকি সময় চায়ের দোকান চালানো।'

তাঁর এই কাজ দেখে কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। তাঁদের কেউ পড়ানোর জন্য সময় দিতে লাগলেন, কেউ কেউ বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য ভাত-ডাল-তরকারি ও দুধের দায়িত্ব নিলেন। স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের ক্লাব ব্যবহার করতে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে 'আশা-আশ্বাসন'। এখন তাঁর স্কুলে ৭০ জন শিশু পড়ে। ৫৪ বছর ধরে চা-বিক্রেতা প্রকাশ রাও ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, মালায়ালাম, কন্নড় ও উর্দু মাতৃভাষা ওড়িয়ার মতোই বলতে পারেন। তাঁর লক্ষ্য এই অবহেলিত শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করা।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে প্রকাশ রাওয়ের উল্লেখ করে বলেছেন — তমসো মা জ্যোতির্গময় বেদবাক্য তো সবারই জানা আছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকাশ রাও সেই জীবনাদর্শ তাঁর কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে চলেছেন। সত্যিই তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেশবাসীর প্রেরণাস্রোত হয়ে ওঠেছে। অবহেলিত শিশুদের জীবনে আলোর প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি নিজের নাম সার্থক করেছেন। ▌

যুগস্রষ্টা শিশিরকুমার

কণিকা দত্ত

দ্বিধান্বিত শিশিরকুমার। একদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে পারিবারিক দায়িত্ব। অন্যদিকে, মনের খিদে। মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজি পড়িয়ে মাস গেলে আসে দেড়শো টাকা। সেটা ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকশূন্যহীন দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়া কি ঠিক হবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না শিশিরকুমার।

কিন্তু ক্রমাগত হাতছানি দিচ্ছে মঞ্চ।

১৯২১ সাল। এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলার নাট্যজগৎ। একে একে নিভিছে দেউটি। টিম টিম করে জ্বলছে স্টার, মিনার্ভা আর মনমোহন। গিরিশোত্তর যুগের নাট্যচর্চাকে একা টেনে নিয়ে চলেছেন পুত্র দানীবাবু। কিন্তু তিনি একা আর কতটা করবেন। হাল ছাড়া হতশ্রী অবস্থা বাংলার রঙ্গালয়ের। অন্যদিকে সেই ভাঙা হাটের ফাঁকা মদয়দান দখল করতে নেমে পড়েছেন রুস্তমজী ধোতিওয়ালা। পার্সি ধনকুবের। ভারতীয় নির্বাক চলচ্চিত্র দুনিয়ার আলোড়ন সৃষ্টিকারী ম্যাডান সাহেবের জামাই। ম্যাডান থিয়েটারের কর্ণধার।

বোম্বাইয়ে পার্সি থিয়েটারের রমরমা বাজার। সেই থিয়েটারের জমকালো রঙচঙে বৈভবকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে আমদানি করতে চাইলেন রুস্তমজী। তার জন্য দরকার একজন দক্ষ সেনাপতির। যে নিজে যুদ্ধ করবে, আবার আস্ত একটা বাহিনীকে দাপটের সঙ্গে পরিচালনাও করতে পারবে। আপন ব্যক্তিত্ব আর প্রতিভার দৌলতে বদলে দেবে থিয়েটারের ভাষা। সেই রকম মাল্টি ট্যালেন্টেড প্রতিভা একজনই আছে বাংলায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। টোপ ফেললেন রুস্তমজী। টাকার। বিপুল পরিমাণ টাকার। মাসে সাড়ে সাতশো। কল্পনাতীত অর্থ। সঙ্গে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ। রাতের ঘুম ছুটে গেল শিশিরকুমারের। সাংসারিক কর্তব্যবোধ না, স্বপ্ন পূরণের সিঁড়ি? কোন দিকে পা বাড়াবেন তিনি। ছুটলেন 'মাস্টারমশাই' মন্মথমোহন বসুর কাছে। 'মাস্টারমশাই' উসকে দিলেন ছাত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে। বললেন, 'শিশির তোমার স্থান মঞ্চে। কলেজের লেকচার রুমে নয়। থিয়েটার ডুবতে বসেছে। একে টেনে তোলবার মতো প্রতিভা তোমার আছে। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সফলতা লাভ কর।'

মনে তবুও সংশয়। কোথায় যেন স্বার্থপরতা, অপরাধবোধের কাঁটা খচখচ করছে তখনও। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের টেবিলের উল্টো দিকে। তিনি বসতে বললেন শিশিরকুমারকে। মন দিয়ে শুনলেন অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রতিভাবান ছাত্রটির সমস্যার কথা। সব শুনে স্বভাবচিত গাম্ভীর্যে স্যার আশুতোষ বললেন, 'যদি কলেজের চাকরিতে তোমার মন না বসে বা পেট না ভরে, আমি তোমাকে ইউনিভার্সিটিতেই নেব। আর তুমি যদি ডিসাইড করে থাক যে স্টেজে জয়েন করবে তাহলেও বলব যে সব পেশাই সমান সম্মানজনক, every profession is honourable.' শিশিরকুমারের অন্তঃকরণ যা শুনতে চেয়েছিল তাই যেন প্রতিধ্বনিত হলো স্যারের কণ্ঠে। মনে আর কোনও দ্বিধা বা সংশয় নেই। ম্যাডানের চুক্তিপত্রে সই করলেন শিশিরকুমার।

উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব। সাংস্কৃতিক সচেতনতায় কোথায় যেন একটা ঘাটতি রয়ে গিয়েছে তৎকালীন ছাত্র সমাজের। ছাত্ররা যদি বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ব্যাটনটা ধরতে না শেখে, তাহলে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ অশুভ অরাজকতায় আক্রান্ত হবে। ছাত্র সমাজকে তাই স্ব সাংস্কৃতিক সামিয়ানার নীচে আনতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার বরেণ্য সন্তানরা তৈরি করলেন 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংম্যান'। পরবর্তীকালে যে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় 'ক্যালকাটা ইউভির্সিটি ইনস্টিটিউট'।

১৯০৮ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মেরি গোল্ড ক্লাবের সদস্য হলেন শিশিরকুমার। তিনি তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। ইনস্টিটিউটের নাট্যবিভাগের মাস্টারমশাই ছিলেন মন্মথমোহন বসু। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'গুরু বলে যদি কাউকে মানতে হয়, তবে ওই একটি লোককে। ওই আমার মাস্টারমশাইকে।' ইনস্টিটিউটের পত্রিকা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারিও ছিলেন শিশিরকুমার।

১৯০৯ সালে ১৭ মার্চ ইনস্টিটিউটের ছাত্র সদস্যরা মঞ্চস্থ করলেন 'হ্যামলেট'। নাটকটিতে 'ক্লডিয়াস' ও 'হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা'-এই দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার। এর পর 'কুরুক্ষেত্র'-এ অভিমন্যু, নাম ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব' নাটকে। এ পর্বে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলেন 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ চাণক্যের ভূমিকায়। অভিনয় দেখে মুগ্ধ স্বয়ং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন, 'শিশিরকুমারের চাণক্য বুদ্ধিদীপ্ত এক অসাধারণ অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চরিত্র এঁকেছি, এই অভিনয় তার থেকেও এগিয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের চাণক্য আমার কাছে জীবন্ত।' পরবর্তী দুটি নাটক 'জনা' ও 'প্রবীর'-এও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন শিশিরকুমার।

জন্মসূত্রে সাঁতরাগাছির ভাদুরিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন শিশিরকুমার। বাবা হরিদাস ভাদুড়ী। মা কমলেকামিনী দেবী ছিলেন ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের সুপণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর আচার্যের বড় মেয়ে।

শিশিরকুমারের পিতৃপুরুষের এককালে বিশাল জমিদারি ছিল। কিন্তু বেহিসেবি দানধ্যান করতে গিয়ে কালে কালে সব খুইয়ে বসেন তাঁরা। ইঞ্জিনিয়র হরিদাসবাবু চাকরি করতেন ব্রিটিশ সরকারের পূর্ত বিভাগে। কিন্তু জাত্যভিমানী হরিদাসবাবু সাহেব পিটিয়ে চাকরিটি খোয়ান। পরে অবশ্য চাকরিটি ফিরে পান। কিন্তু কর্মজীবনের অনিশ্চিয়তা, জমিদারি নিয়ে শরিকি বিবাদের দরুন হরিদাসবাবু স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই মনস্থ করেন। তাই শিশিরকুমারের চরিত্র গঠনে মাতামহের প্রভাব প্রবলভাবে পড়েছিল। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ তিনি মাতামহের সূত্রেই পেয়েছিলেন। আর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন জাতীয়তাবোধ, আত্মসম্মান জ্ঞান, স্পষ্ট ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

মাতামহের কাছ থেকে শৈশবে শিশিরকুমার যেমন সাহিত্যানুরাগ ও আবৃত্তি-প্রীতি লাভ করেছিলেন, তেমনই তিনি অভিনয়-প্রীতি লাভ করেছিলেন দুই মামার কাছ থেকে। শিশিরকুমার যখন পেশাদার অভিনেতা হওয়াই মনস্থ করেন তখন সকলের আগে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ছোটোমামা ফণীন্দ্রকিশোর আচার্য ও মা।

১৯০৫ সালে শিশিরকুমার বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তাঁর ছাত্র জীবনের তিন পর্যায়, বঙ্গবাসী, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (স্কটিশ চার্চ) ও প্রেসিডেন্সি। স্কটিশে তিনি থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র ছিলেন। এখানে তিনি সহপাঠী হিসেবে পান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রমুখ কৃতীদের। শিশিরকুমার সহ এঁরা সকলেই প্রেসিডেন্সি থেকে এম.এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম.এ. পড়ার সময়ই শিশিরকুমার অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সংস্পর্শে আসেন। এবং তাঁর উৎসাহেই শিশিরকুমার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের জুনিয়র সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটে অভিনয়ের টানে প্রায়ই ক্লাস পালাতে শুরু করলেন শিশিরকুমার। সহপাঠী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্সিতে এম.এ. ক্লাসে তাহার ক্লাস পলায়ন বৃত্তি একটা রীতিমতো শিল্পকলায় উন্নীত হইল।’

এম.এ. পাশ করার পর গতানুগতিক নিয়মে পরিবার প্রতিপালন ও ছোটো ভাইদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এসে পড়ল শিশিরকুমারের উপর। ইতিমধ্যে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাবার ইচ্ছা ছিল বড় ছেলে হাইকোর্টের উকিল হবে। ততদিনে বিয়েও করে ফেলেছেন শিশিরকুমার। আগ্রার বিখ্যাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা ঊষাদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় শিশিরকুমারের। তবে তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী। অকালে প্রয়াত হন ঊষাদেবী।

প্রবল পারিবারিক দায়বদ্ধতায় ১১৯৪ সালে মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন শিশিরকুমার। ইনস্টিটিউটের নাটকগুলিকে তৎকালীন নাট্যমোদীরা বলতেন শৌখিন থিয়েটার। এছাড়াও সেই সময়ে ওল্ড ক্লাব ও ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাবের সদস্যরাও শৌখিন থিয়েটার করতেন। শিশিরকুমার এই দুই ক্লাবের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ক্রমে ‘শৌখিন অভিনেতা’ হিসেবে শিশিরকুমারের নাম শহরের শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে পড়ল।

পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার আগে ওল্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে শিশিরকুমার স্টারমঞ্চে ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ অভিনয় করেন। নাটকটিতে তিনি একইসঙ্গে ‘ভীম’ ও ‘জনৈক ব্রাহ্মণ’-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু আরও একটি কারণে এই নাটকটি শিশিরকুমারের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’-এই শিশিরকুমার প্রথমবার একইসঙ্গে প্রয়োগকর্তা, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক হিসেবে অবতীর্ণ হন। এই নাটকটির সার্বিক সাফল্য শিশিরকুমারকে নট হিসেবে খ্যাতির তুঙ্গে তুলে দেয়। শিশিরকুমারের নাম শহরের বিদ্বজ্জনের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। ঠিক এমন সময়ে বাংলা থিয়েটারের জগতে পার্শি ধনকুবের ম্যাডান সাহেবের ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব। এই কামিনীকাঞ্চন যোগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশের ক্ষণও যেন সূচিত হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ নবযুগের অনন্য প্রতিভাবান অভিনেতাদের প্রকাশ্য থিয়েটারের আবির্ভাবের দিনও যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ‘শৌখিন অভিনেতা’।

ম্যাডানের বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানির ‘আলমগীর’কে কেন্দ্র করে আর কয়েকদিন পরেই শুরু হবে বাংলার নব নাট্য আন্দোলন। এহেন যুগসন্ধিক্ষণে পা রাখার আগে আরও একটি নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটালেন শিশিরকুমার। সেটি হলো সঙ্ঘ চেতনা বা গ্রুপ থিয়েটারের ভাবনা। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে প্রাযোজিত নাটকগুলি ছিল সেই সঙ্ঘ চেতনার সলতে। কেউ বড় নয়। প্রত্যেকেরই গুরু দায়িত্ব আছে। সবাই মিলে একটা নাট্য প্রযোজনাকে সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই বোধটা বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে আমদানি করলেন শিশিরকুমার। যাকে পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। শিশির সহপাঠী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘সঙ্ঘ চেতনা গড়ে তুলবার আকর্ষণীয় শক্তি ছিল শিশিরের। চেহারায়, চালচলনে, কথাবার্তায় একটা সহজ আন্তরিক হৃদ্যতায় শিশির সকলকেই আপনার করে নিতে পারত।’

বাগবাজারের শখের দল থেকে একদিন জন্ম নিয়েছিল সাধারণ থিয়েটার বা কমার্শিয়াল থিয়েটার। সেই থিয়েটারের উজ্জ্বলাভা যখন স্তিমিত হয়ে এলো, তখন সেইখানে একদল শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমারপকে সামনে রেখে নবযুগের প্রর্বতন করলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৫৬ শিশিরযুগ। সে ইতিহাস ভিন্ন। সখের অভিনেতাদের সঙ্গে শৌখিন অভিনেতাদের পার্থক্য ছিল, শৌখিন অভিনেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। শিশিরযুগে রঙ্গমঞ্চে সেই মেধারই উন্মেষ ঘটল। বাংলা নাটকে উঠে এলো জাতীয়তাবাদ, সমাজ ও সংসারের টানাপোড়েনের জলজ্যান্ত দৃশ্য। যা পরবর্তীকালে গণনাট্য আন্দোলনকে উসকে দেবে। শিশিরকুমার ছিলেন সেই যাত্রাপথের অগ্রপথিক। তিনি চেয়েছিলেন একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ করতে। যেখানে গ্রামবাংলার নিজস্ব নাট্যরূপ যাত্রাকে কালপোযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই স্বপ্নকে অধরা রেখে ১৯৫৯ সালে জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে প্রস্থান করেন শিশিরকুমার। ■

লোকান্তরিত হলেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ

পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ গত অক্টোবর ৯৮ বছর বয়সে বারাণসী ধামে পরলোকগমন করেন। অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্তের উপস্থিতিতে কাশীর মণিকার্ণিকা ঘাটে তাঁর মরদেহ

জলসমাধিস্থ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আশ্রমের মাধ্যমে সেবাকাজ ও হিন্দুধর্মের প্রচার-প্রসার নিরন্তর গতিতে চলছে। তিনি বিশ্ব বিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে এমনকী স্বস্তিকা পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি স্বস্তিকায় সমসাময়িক বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁরই একান্ত উৎসাহে কলকাতার নিউ রায়পুরস্থিত তাঁর আশ্রম প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি বালক শাখা চলত এবং সঙ্ঘের গুরুদক্ষিণা ও রক্ষাবন্ধন প্রভৃতি উৎসবও অনুষ্ঠিত হতো। অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলনের যখনই বিভিন্ন পর্যায় এসেছে, তখন কখনও রামশিলা, কখনও রামপাদুকা, কখনও রামরথ, কখনও বা রামসেতু রক্ষায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন। বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ অদ্বৈতপন্থী শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী বলে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুত্বের উপর তিনি বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গল্পে গীতা', 'সাধক সোপান' ও টীকাসহ শ্রীমদভগবৎ গীতা। তাঁর দেহান্তের সংবাদ পেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত স্থানীয় কয়েকজন স্বয়ংসেবককে নিয়ে কলকাতা আশ্রমের স্বামী শ্রদ্ধাত্মানন্দপুরী মহারাজ, কমল গুপ্ত, অনিল কুণ্ডু প্রমুখ ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর প্রয়াণে হিন্দু সমাজ হিন্দুত্বরক্ষার একজন অগ্রদূতকে হারাল।

শোকসংবাদ

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংস্কার ভারতীর সাধারণ সম্পাদক উত্তর কলকাতা নিবাসী ভরত কুণ্ডুর বড়োদাদা শঙ্করনাথ কুণ্ডু গত ২৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার গৌড় খণ্ডের কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক দেবাশিস দাসের পিতৃদেব রঘুনাথ দাস গত ৩১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শ্যামপুকুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রবাল বসু গত ২০ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, একপুত্র, এক কন্যা এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবদের রেখে গেছেন। কলকাতার এক বনেদি পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহের নামে কলকাতার একটি পরিচিত রাস্তার নাম ভুপেন বসু এভিনিউ। তিনি এক সদাহাস্যময় ব্যক্তি ছিলেন। অপরকে সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের পশ্চিমবঙ্গ শাখার একদা প্রমুখ কার্যকর্তা ছিলেন। গত ২৭ অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক স্মরণসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সুনীল রায়, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ জয়ন্ত পাল, বিজয় আঢ্য প্রমুখ।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের বাঘাযতীন ভাগ সঙ্ঘচালক তথা পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা ভারতীর প্রবীণ কার্যকর্তা সীতেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী মায়া ভট্টাচার্য গত ২৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

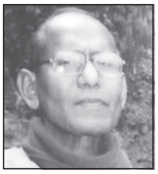

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর খণ্ডকার্যবাহ বিপ্লব দিন্দার এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির জেলা শারীরিক প্রমুখ শ্রাবণী দিন্দার পিতৃদেব ভগবানপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক পশুপতি দিন্দা গত ২৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও কন্যা রেখে গেছেন।

ভারত-পাক সীমান্তে ১৬০ জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্য নিয়ে পাক সীমান্তে ১৬০ জঙ্গি আত্মগোপন করে রয়েছে। সম্প্রতি সংবাদ সূত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নাগরোটা ১৬ কর্পসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইন কমান্ড লেফটেনান্ট জেনারেল পরমজিৎ সিংহ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের বিভিন্ন স্তানে ১৪০—১৬০ জঙ্গি আত্মগোপন করে রয়েছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভারতে অনুপ্রবেশ করে হামলা চালানো। তবে এবার এই জঙ্গিরা তাদের কৌশল কিছুটা বদল করেছে বলেও অনুমান করছেন এই সেনাকর্তা। তিনি বলেছেন, শীতে যখন ভারী তুষারপাত হয় তখন ভারতীয় সেনা কিছুটা নীচের দিকে নেমে আসে। আর সেই সুযোগেই জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে এপারে ঢোকার চেষ্টা করে। যে পথ দিয়ে জঙ্গিরা সাধারণত অনুপ্রশে করে, এবার তা না করে নতুন পথ খুঁজে বের করে সেই পথ দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে। তবে কোনও পরিস্থিতিতেই যে তাদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি রয়েছে ভারতীয় সেনা— তাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পরমজিৎ সিংহ। তিনি জানিয়েছেন, দেশের সবকটি নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে সেনাবাহিনী। সীমান্তে যেভাবে পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে তা নিয়েও সমালোচনা করেছেন পরমজিৎ সিংহ। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের স্বভাব কোনওদিন বদলাবে না। দ্বিপাক্ষির স্তরে বৈঠকের পর সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা কিছুটা কমেছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সীমান্তে আমাদের যে জওয়ানরা প্রহরায় রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই চুক্তি অর্থহীন। কারণ, প্রায়শই তাঁদের ওপর পাক সেনাদের গুলি-গোলা ছুটে আসে। তবে আমরাও ইটের জবাব পাটকেলে দিতে শুরু করেছি।। সীমান্তে এভাবে চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনা কবে বন্ধ হবে জানতে চাইলে পরমজিৎ সিংহ জানান, পাকিস্তান যতদিন না তাদের মনোভাব বদলাচ্ছে ততদিন আমাদের পালটা প্রতিরোধ চালিয়ে যেতেই হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শত্রুসম্পত্তির অংশ বিক্রির রূপরেখা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গত ৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে শত্রু সম্পত্তির অংশ বিক্রির জন্য নীতি, পদ্ধতি ও রূপরেখা অনুমোদন করা হয়। ১৯৬৮ সালের শত্রু সম্পত্তি আইনের নির্দিষ্ট ধারা মোতাবেক এইসব সম্পত্তির অভিভাবক হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও ভারতের শত্রু সম্পত্তি অভিভাবক সংস্থা(সিইপিআই)। এই সম্পত্তির অংশ বিক্রির জন্য মন্ত্রীসভা নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। বিনিযোগ ও জনসম্পদ পরিচালন দপ্তরকে শত্রু সম্পত্তি আইনের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী এই সম্পত্তি বিক্রয়ের কর্তৃত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রকের সরকারি অ্যাকাউন্টে বিলগ্নিকরণ বাবদ আয় হিসেবে এই অর্থ জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতে ৯৯৬ টি কোম্পানির ২০ হাজার ৩২৩ জন শেয়ার মালিকের মোট ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৮৭ টি শেয়ার শত্রু সম্পত্তি অভিভাবক সংস্থার অধীনে রয়েছে। এই কোম্পানিগুলির মধ্যে ৫৮৮ টি সক্রিয় বা কার্যকর রয়েছে। এর মধ্যে ১৩৯ টি সংস্থা নথিভুক্ত। এই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প ব্যবস্থা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। এই কমিটি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলির মূল্য ও পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে যেসব শত্রু সম্পত্তির অংশ দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহৃত হিসেবে পড়ে অছে, তার আর্থিক ব্যবহার সম্ভব হবে। ২০১৭ সালে শত্রু সম্পত্তি আইনের সংশোধনের ফলে এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিক্রির ও যথাযথ ভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

টেলিফোন যন্ত্রপাতি সংগ্রহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রায়ত্ত বিএসএনএল, এমটিএনএল এবং বিবিএনএল-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মেসার্স আইটিআই লিমিটেডের সংগ্রহ কোটায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন মিলেছে। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গত ৮ নভেম্বর নতুন দিল্লিতে মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত মেসার্স আইটিআই লিমিটেডের সংগ্রহ কোটা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রস্তাবেও মন্ত্রীসভার অনুমোদন মিলেছে। এগুলি হলো— সংস্থার যে রিজার্ভেশন কোটা পলিসি বা সংরক্ষণ বিষয়ক নীতি রয়েছে তা অব্যহত থাকবে। এই সংস্থা যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করবে তার ৩০ শতাংশ সংগ্রহ করবে বিএসএনএল, এমটিএনএল এবং বিবিএনএল। বিএসএনএল, এমটিএনএল এবং বিবিএনএলের থেকে জিএসএম, ওয়াইফাই চালু করার মতো পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়বে তার ২০ শতাংশ জোগাবে আইটিআই লিমিটিড। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মূল্য জানা এবং বাণিজ্যিক ভাবে সুবিধাজনক হলে তবেই আইটিআই সংস্থা তার রিজার্ভেশন কোটার আওতায় বরাত নেবে। নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রিজার্ভেশন কোটার আওতায় আইটিআই তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদনের দিন থেকে পরবর্তী তিন বছর সংগ্রহ ব্যবস্থার এই নীতি কার্যকর থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আইটিআই সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই নীতি পর্যালোচনা করতে হবে।

বারুইপুরে জোর করে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ বর্গ বন্ধ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বর্গ জোর করে বন্ধ করল পুলিশ। কালীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত ২৭ অক্টোবর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিধিবদ্ধ অনুমতি নিয়েই এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ বর্গ শুরু হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৯৯ জন শিক্ষার্থী তাতে অংশগ্রহণ করেন। ২৭ তারিখ সকালেই স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক মানস ময়রা স্কুলের তালা খুলে দেন। বিকেল থেকে যথারীতি বর্গ শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি হালদার ফোন করে খোঁজ নেন সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না।

সেদিনই রাত্রি প্রায় বারোটায় প্রধান শিক্ষক জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালীকে ফোনে জানান, প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে স্কুলে সঙ্ঘের শিবির বন্ধ কর দিতে। এর পরই রায়দিঘি থানার এক এস আইয়ের নেতৃত্বে দুই ভ্যান সশস্ত্র পুলিশ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি স্কুলে আসেন। তাঁরা প্রধান শিক্ষকের ঘরে জেলা সঙ্ঘচালককে ডেকে হুমকির স্বরে বলেন এক্ষুনি শিবির বন্ধ করে দিতে হবে। জেলা সঙ্ঘচালক জানান, শিক্ষার্থীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, আগামীকাল সকালে তারা স্কুল ছেড়ে দেবেন। কিন্তু এস আই ধমকের সঙ্গে বলেন, এক্ষনি স্কুল ছেড়ে না দিলে লাঠি চার্জ করে স্কুল ফাঁকা করা হবে। অগত্যা রাত্রি তিনটের সময় স্বয়ংসেবকরা স্কুল ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে তড়িঘড়ি অন্য এক জায়গায় বর্গের ব্যবস্থা করা হয়।

এঘটনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাদের অভিযোগ, শাসক দলের নির্দেশে পুলিশ স্কুল কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং পুলিশ এখানে দলদাসের ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৩১ অক্টোবর সঙ্ঘের কার্যকর্তারা রায়দিঘি থানায় স্মারকলিপি দিতে গেলে ওসি নিতে অস্বীকার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকার হিন্দু সমাজ ক্ষোভে ফুঁসছে।

মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে বিদ্যার্থী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের ওপর অত্যাচার বিপজ্জনক ভাবে বেড়েছে। কর্মরতা মহিলারা তো বটেই, স্কুল- কলেজের ছাত্রীরাও এখন আর নিরাপদ নন। অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হলে মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখা দরকার। এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দেশ জুড়ে মেয়েদের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। মেয়েদের আত্মরক্ষায় পারদর্শী করে তোলার এই প্রকল্পটির নাম 'মিশন সাহসী'।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিটি জেলায় মিশন সাহসীর প্রশিক্ষণ শিবির হয়। শিবিরে আত্মরক্ষার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি শেখানো হয়, যাতে তারা সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র যেমন পেন, পেন্সিল, চুলের কাঁটা, হাতের চুড়ি ইত্যাদির দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। মিশন সাহসীর প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় এবছরের ৬ মার্চ মুম্বই শহরে। গত ৩০ অক্টোবর দিনটি নারী ক্ষমতায়ন দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এদিন মিশন সাহসী প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক হাজারেরও বেশি মহিলা অংশগ্রহণ করেন। সারা দেশে মিশন সাহসীর ২৭৫ টি প্রশিক্ষণ শিবির হয়, তাতে কয়েক লক্ষ মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পরলোকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্তকুমার

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্তকুমার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে বয়েস হয়েছিল ৫৯ বছর। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং বিজেপির শীর্ষস্থানীয় এই নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ আরও অনেকে। অনন্তকুমারের রাজনীতিতে হাতেখড়ি ছাত্রজীবনেই। দেশে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয় তখন অনন্তকুমার ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরুণ নেতা। জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করায় তাঁকে জেলে যেতেও হয়েছিল। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। গত চার দশকে কার্যত বিজেপির মুখ হয়ে উঠেছিলেন অনন্তকুমার। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদী তাঁকে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব দেন। সে দায়িত্ব তিনি যথাযথ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। অনন্তকুমারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, কর্ণাটকবাসী এবং দেশবাসীর পক্ষে এই মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী অনন্তকুমারের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি।' কতকটা একই সুরে শোকপ্রকাশ করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ. ডি. কুমারস্বামীও। তিনি বলেন, 'অনন্তকুমারের মৃত্যুতে আমি একজন ভালো বন্ধু হারালাম।'

ধৃত আই এস জঙ্গির স্বীকারোক্তি

ধর্মের নামেই মগজ ধোলাই মুসলমান যুবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাসবাদের নাকি কোনও ধর্ম হয় না! ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা অন্তত তেমনটাই বুঝিয়ে থাকেন। যদিও এদের অসদুদ্দেশ্য জানতে কারোর বাকি নেই। সম্প্রতি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)-র হাতে ধৃত আই এস জঙ্গি দলে নাম লেখানো নাসিদুল হামজাফরের স্বীকারোক্তি ফের প্রমাণ করল ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। কেরলের ওয়ানাড জেলার কালপেটা গ্রামের ছাব্বিশ বছরের যুবক নাসিদুল গত সেপ্টেম্বরে এন আই এ-র হাতে ধরা পড়ে। জেরায় সে জানিয়েছে, ২০১১ সালে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক স্তরে পড়ার সময় তার সঙ্গে আলাপ হয় শিহাস ও বেস্টিন ভিনসেন্ট নামে দুই যুবকের। শিহাস কট্টর ধর্মান্ধ মুসলমান ও ভিনসেন্ট ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। এরাই জোর করে তাকে আই এসে যোগ দিতে বাধ্য করে বলে নাসিদুলের দাবি।

তার কথায় আই এসে যোগ দেওয়ার মতো আকর্ষণীয় তখনও কিছু দেখেনি সে। এই পরিস্থিতিতে নাসিদুলকে ইয়েমেনি ধর্মযাজক আনওয়ার আল আওলাকির উপদেশ শোনানো হয়, যার লক্ষ্যই ছিল তাকে আই এসের রক্তক্ষয়ী ইসলামিক আদর্শে দীক্ষিত করা। দুবাই ও নিউজিল্যান্ডে 'কেরিয়ার' গড়তে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু 'ধর্মোপদেশ' শুনে সে ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামিক সন্ত্রাসে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় নাসিদুল। ২০১৬-য় নাসিদুল কেরলে তার বাবা-মার কাছে ফিরে আসে। একটি অটোমোবাইল প্রশিক্ষণ কোর্সেও যোগ দেয়।

আপাতভাবে সন্ত্রাসী কাজকর্ম ছেড়ে দিলেও ইসলামিক সন্ত্রাস তাকে ছাড়ে না। কয়েকমাস বাদেই শিহাসের কাছ থেকে হোয়াটস অ্যাপে বার্তা আসে নাসিদুলের কাছে : 'আসসালাম অ্যালেকুম'। ভীত নাসিদুল নাকি এতে কোনও জবাব দেয়নি। অন্তত এন আই এ-কে দেওয়া বিবৃতিতে তেমনটাই বলেছে সে।

এরপর নাকি তার কাছে ক্রমাগত অডিও ক্লিপ পাঠাতে থাকে শিহাস। তাতে ভয় ধরানো কথার পাশে ইসলামিক ধর্মবাণীও থাকতো। সিরিয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'তরোয়ালের ছায়ায় যুদ্ধ জয়' ইত্যাদি প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমেও নাসিদুল হামজাফরের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা হয়। পাশাপাশি জাকির নায়েক, মুফতি মইঙ্ক, নোমান আলিখান, বিলাল ফিলিপের মতো সন্ত্রাসবাদী ইসলাম ধর্মগুরুদের বাণীও তাকে শুনিয়ে গোঁড়া মুসলিম করে তোলবার চেষ্টা চলেছিল এতটাই যে, বাড়ির সদস্যদের টিভি দেখা বন্ধ করা, মা-বোনকে পুরো বোরখা পরতে বাধ্য করা, এমনকী নাসিদুলের বাবা তাকে দাড়ি কাটতে বললেও তা অস্বীকার করে সে।

স্বাভাবিক ভাবেই আই এস বা অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলি কীভাবে যুবকদের মগজধোলাই করে তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত তথ্য যে ইসলামকে হাতিয়ার করেই 'আল্লার রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার টোপ দেখিয়েই যুবকদের মগজ ধোলাই করে তারা। যদিও ভোট লালসায় মত্ত এদেশের কিছু রাজনৈতিক দল ও তাদের পদলেহী জনকয়েক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানবতাবাদের আড়ালে 'ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসের যোগ নেই' তত্ত্ব খাড়া করে অপরাধের মূল সূত্র থেকে এদেশের মানুষের নজর ঘোরাতে চাইছেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সাহিদুলের স্বীকারোক্তি এই তত্ত্বে ফের সিলমোহর দিল।

পুস্তক প্রসঙ্গ

বিপ্লবী থেকে ঋষি অরবিন্দের উত্তরণের কাহিনি

বিজয় আঢ্য

শ্রী অরবিন্দের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক শেখর সেনগুপ্ত বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে ঋষি অরবিন্দের উত্তরণের কাহিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় পর্বের জীবনকথা (১৯১০-১৯৫০) পণ্ডিচেরীতেই যার সূচনা ও সমাপ্তি, তারই এক তথ্যনিষ্ঠ অথচ রসগ্রাহী বিবরণ সুনিপুণ শৈলীতে তিনি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী যাত্রাপথের ও সেখানে পৌঁছানোর পরের কয়েকটি বছর অরবিন্দের দিনযাপন কণ্টকাকীর্ণ না হলেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইংরেজ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি ও নিজেদের বিপদের সম্ভাবনা বুঝেও যে সকল গুণমুগ্ধ বন্ধু ও অনুরাগী শ্রীঅরবিন্দের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের কর্ণধার মতিলাল রায়। আর পণ্ডিচেরীর ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক তথা কার্যাধ্যক্ষ শ্রীনিবাসাচারী, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, মুঙ্গেশ চেট্টিয়ার প্রমুখ।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, সক্রিয় রাজনীতি থেকে শ্রীঅরবিন্দের অবসর গ্রহণের অর্থ এই নয় যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক তুঙ্গে নিজেকে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জগৎ ও ভারতের ভাগ্য বিষয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। যদিও বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এটিই। বস্তুত তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এই সময়ে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'আর্য'-এ প্রকাশিত হয়। যোগ থেকে শুরু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এমনকী, ১৯২৬-এর শেষের দিকে তিনি যখন নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে সরিয়ে নিয়েছেন, তখনও অজস্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে অক্লান্তভাবে শিষ্য ও অনুসন্ধিৎসুদের প্রশ্ন, সমস্যা বা বিদ্রোহী মনোভাবের সমাধান করেছেন। 'আর্য'-তে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের রচনাগুলির যে বঙ্গানুবাদ লেখক করেছেন, বঙ্গভাষীদের কাছে তা এক অমূল্য প্রাপ্তি। এই পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজের জন্য তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এইসব লেখায় বিভিন্ন বিষয়ে নিজের গভীর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন, যেমন, বেদ। বেদ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ছিল। সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের জাতীয়তা, শিক্ষাভাবনা, কংগ্রেস, লোকমান্য

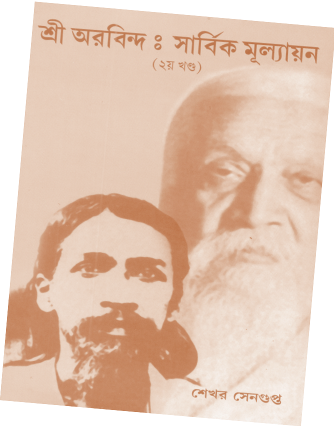

তিলক, গান্ধীজী, হিন্দু- মুসলমান সম্পর্ক, এমনকী চীন ও রাশিয়ার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ ১৯৩৪ সালে যা লিখেছেন, লেখক তা আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য— ''হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয়ে সম্প্রতি যে ধরনের অন্যায় আদিখ্যেতা দেখানো হচ্ছে, তার পিছনে কোনও শুভবুদ্ধি আছে বলে আমার মনে হয় না। এরা রাজনীতি করতে গিয়ে ভারতের অতীত মহত্ত্ব ও তার আধ্যাত্মিকতাকে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে এমনভাবে নস্যাৎ করতে চাইছেন, যেন ওইগুলির স্থান হওয়া উচিত ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে।'' আর এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখার জন্য তিনি দায়ি করেছেন কংগ্রেসকে। মৃত্যুর তিন বছর আগে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টে ভারতের স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে, যেদিন তাঁর নিজের জন্মদিনও, প্রদত্ত বাণীর একটি অনুচ্ছেদের অংশবিশেষে জানিয়েছেন— ''আশা করা যায়, জাতীয় কংগ্রেস এবং দেশ এই স্থিরীকৃত ঘটনাকে চিরকালের জন্য স্থির সত্যরূপে অথবা সাময়িক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু বলে গ্রহণ করবে না। কারণ, তা যদি স্থায়ী হয়, ভারত তাহলে সাংঘাতিকভাবে দুর্বল, এমনকী পঙ্গুও হয়ে পড়তে পারে।'' লেখকের এই তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ শ্রীঅরবিন্দের মূল্যায়নের বহুলাংশে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

১৯১০ থেকে ১৯৫০ এই চল্লিশ বছরের কালপর্বের প্রথম ষোলো বছর তাঁর জীবন আবর্তিত হয়েছে আশ্রমের নিভৃতে— সাধন, ভজন, রচনা ও শিক্ষা নিয়ে গড়া পরিমণ্ডলে। জাতীয় জাগরণ ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাল ধরবার অনুরোধ নিয়ে কিংবা দিব্য সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে অনেকেই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। স্বনামধন্য এইসব মানুষের মধ্যে রয়েছেন তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সুব্রহ্মণ্যম ভারতী, ফরাসি আমলা এম পল রিশার (মীরা রিশারের স্বামী পরবর্তীকালে যিনি শ্রীমা), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সরলাদেবী, নাগপুরের ডাঃ মুঞ্জে, দিলীপ কুমার রায়, লালা লাজপত রায়, পুরষোত্তমদাস ট্যান্ডন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্বোপরি শ্রীমা। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট নোবেল যেমন ভগিনী নিবেদিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন, তেমনই শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে ফ্রান্সের মীরা রিশারের শ্রীমাতে উত্তরণের কাহিনিটি লেখক অসাধারণ শৈলীতে বর্ণনা করেছেন। বাগাড়ম্বর নয়, শব্দ প্রয়োগের নিপুণতায় যা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, স্রোতস্বিনীর মতো যা তর তর করে এগিয়ে যায় এমন সাবলীল শৈলী যা পাঠককে রসসিক্ত করে তোলে। দুই মলাটের সামান্য পরিসরে শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপর্বের জীবন কথার এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশন যা আরও গভীরভাবে তাঁকে জানবার জন্য আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ন (২য় খণ্ড)। লেখক : শেখর সেনগুপ্ত। মূল্য : ২৫০ টাকা। প্রকাশক : প্রিটোনিয়া, ১৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

সাপ্তাহিক রাশিফল

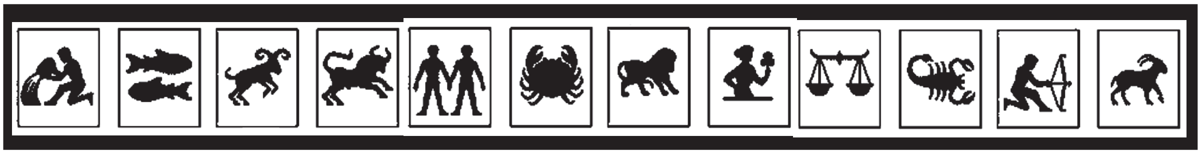

১৯ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ২৫ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, রবি, বক্রী, বুধ, ধনুতে শনি, মকরে কেতু এবং কুম্ভে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে মিথুনে মৃগশিরা নক্ষত্রে।

মেষ : সপ্তাহটিতে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততা বয়োজ্যেষ্ঠের শারীরিক অসুস্থতায় উদ্বেগ। মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তায় সাফল্য ও সিদ্ধি করায়ত্ত করবেন। গবেষণারতদের শংসা ও স্বীকৃতি লাভের যোগ। আর্থিক লেনদেন ও লিখিত চুক্তিতে সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমানন্দে প্লাবিত মন। স্ত্রীর শিল্প সৌন্দর্য কলাকুশলতায় সাফল্য।

বৃষ : পারিবারিক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ। পেশাদার জীবনে একাধিক শুভ যোগাযোগ ও নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। নিজ উদ্ভাবনী শক্তি ও লাইফ পার্টনারের দূরদৃষ্টির সফল রূপায়ণে আর্থিক গতি ত্বরান্বিত হবে। নিকট ভ্রমণ। প্রতিবেশীর ব্যবহারে ব্যাথিত ও ভারাক্রান্ত মন। সংক্রমণ ব্যধির সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব।

মিথুন : খনিজ, চর্ম, পশম ব্যবসায় শুভ। কষিকাজে পূর্ণতার যোগ। গাড়ি-বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ অথবা নতুন ক্রয়ের সম্ভাবনা। হঠাৎ হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বারা প্রতারণার সম্ভাবনা। বিলাস-ব্যসন ও রুচিসম্মত খাদ্যের সমাহার, উপহার সামগ্রী লাভ ও হঠাৎ প্রাপ্তি যোগ। সামাজিক উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

কর্কট : শরীরের যত্নের প্রয়োজন— হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ও হৃদরোগ বিষয়ে। আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়ে সাফল্য মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে। ভ্রাতা-ভগ্নী-সন্তানের উচ্চাশিক্ষা ও কর্মে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্তি। ভোগ-আড়ম্বর তথা আধুনিকতার পরশে অতিবাহিত সপ্তাহ।

সিংহ : কৌশলী মনের রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। মনঃসংযোগের অভাব হেতু বিদ্যার্থীর আশানুরূপ ফল লাভে অন্তরায়। মাধীশ, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদের সৃষ্টির আনন্দ, সম্ভ্রম, হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সামাজিক আনন্দযজ্ঞে বহুমুখী কর্মপ্রয়াস। গাড়ি, ঔষধী, বস্ত্র, কসমেটিক্স ব্যবসায় প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুভ। বিজাতীয় সংস্পর্শে পার্থিব সুখ।

কন্যা : প্রতিবেশী ও স্বজন বান্ধব-সহ শুভ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। লাইফ পার্টনারের যশ-সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ। অভিনয়, সঙ্গীত, কাব্য-কলা ও সংস্কৃতির জগতের ব্যক্তিদের প্রতিভার ব্যাপ্তি, বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব, গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের শল্যচিকিৎসার সম্ভাবনা।

তুলা : আর্থিক ও সমাজ প্রগতিমূলক কাজে প্রত্যয় দীপ্ত পথচলা। বিতর্ক এড়িয়ে চলা শ্রেয়। ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মসংস্থানে শুভ ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সপ্তাহ। দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণ মনকষ্টের কারণ।

বৃশ্চিক : চিন্তায় দৈবী কৃপালাভ। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পিপাসুদের মূল্যবোধের পরিসর, যশ ও বৈরাগ্যের স্বাক্ষর বৃদ্ধি, ব্যবসায় নব উদ্যোগের বাস্তবায়ন। মাতুলস্থানে স্বাস্থ্য বিষয়ে তৎপরতা বাড়বে।

ধনু : বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব, স্বীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান ও অর্থ প্রাপ্তি। পেশাদারিত্বের উন্নতি ও দূরস্থানে বদলির সম্ভাবনা। সন্তানের মেধা ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি। পৈতৃক সূত্রে অর্থ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি, বিদেশ যাত্রার যোগ।

মকর : প্রশাসনিক রদবদলের সম্ভাবনা, বিরোধিতা বৃদ্ধি, চোখ ও পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সরকারি তরফে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। চিন্তা-ভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন, অধস্তন কর্মচারীদের চালচলনে শান্ত ও সংযত থাকুন।

কুম্ভ : জ্ঞান বৃদ্ধি, ন্যায়-সততা ও সুন্দরের পুজারি, কর্মদক্ষতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির অভিনব প্রয়াসে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। কৃষিজীবী, ব্যবহারজীবী, সমাজসেবী সকলের ক্ষেত্রে সঠিক শুভ সময়।

মীন : পূর্ব নির্ধারিত সময়েই শুভ কাজের চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর্থিক সাচ্ছল্য ও কর্মস্থানে শান্তি বজায় থাকবে। খেলোয়াড়, বাগ্মী, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যার্থী, শিক্ষক, প্রশিক্ষকদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। তীর্থদর্শন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি। নতুন আঙ্গিকে জীবন পরিচালিত হবে।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য